বনকপোতী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ
২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ, ১৩৬৩ সাল

প্রকাশক : কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ

২০৩/৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর : শ্রীঅরবিন্দ সরদার

শ্রীপ্রিন্টিং ওয়ার্কস

৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

পূর্ণ চক্রবর্ত্তী

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

মূল্য : তিন টাকা চার আনা

সাগরময় ঘোষ

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের :

ইরাবতী (২য় সং)

উপকূল

আরাকান

অন্যতমা (২য় সং)

মৃত্তিকার রং

প্রান্তিক

সপ্ত কন্যার কাহিনী

নারী ও নগরী (যন্ত্রস্থ)

সুরবাহার (যন্ত্রস্থ)

বর দেখে পারুল মুখ ফেরাল।

কদমছাঁট চুল, প্রসাধনের বালাই নেই। গায়ে আঁটসাঁট খদ্দরের জামা। ধুতির বহর হাঁটুরও ওপরে। বরবেশেই এই, অন্য সময়ে তো জামার সঙ্গে সম্পর্কই থাকবে না।

পারুলকে দেখতে বর নিজে আসেনি। জনদুয়েক বন্ধুকে পাঠিয়েছিল। তারাই টিপে টিপে আলু পরখ করার মতন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করেছে। রান্নাবান্না, কাজকর্ম, সেলাই-ফোঁড়াই সব কিছুর খবর। চাকতি খোঁপা খুলে চুল এলো করিয়ে মেপেছে, হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়েছে পারুলকে। বলা যায়, ফাঁক পেয়ে খোঁড়া মেয়েই হয়তো পাচার করিয়ে দেবে, মেকি দুয়ানি চালানর মতন! সব দেখেছে, কেবল লেখাপড়ার বিষয়ে একটিও প্রশ্ন করেনি। বরের বারণ। ইস্কুল মাস্টারের বৌ। দরকার হলে মেজে ঘষেই নেবে না হয়। ছাত্র পড়ানর ফাঁকে ফাঁকে বউকেও তালিম দেবে।

পারুলই না হয় এর আগে দেখেনি বরকে, কিন্তু তার বাবা তো দুবার গেছেন কুসুমপুরে। আশেপাশে খোঁজখবরও নিয়েছেন। নিজের

চোখে দেখেও এসেছেন পাত্রকে। বলিহারি পছন্দ। এমন মেয়ের পাশে এই আধবুড়ো বর। এদিক-ওদিক ফিসফিসানি, চাপা কথা পারুলের মা-বাপ কারুর কান এড়াল না। সব শুনে মা চোখে আঁচল চাপা দিলেন। বাপ দীর্ঘশ্বাস সামলালেন বুকে বালিশ চেপে। এ ছাড়া করবারই বা কি আর ছিল! মেয়ের রূপের আন্দাজে যদি সেই রকম রূপোও ঢালতে পারতেন, তবেই না। একশ সাত টাকা মাইনের বেসরকারি অফিসের কেরানী বাপের এর চেয়ে বেশি সামর্থ্যই বা কোথায়! তাও আবার এটি সবেধন নীলমণি নয়। বৌয়ের গয়না বেচে বড়টিকে পার করেছেন, আরও একটি গোকুলে বাড়ছে। কাজেই কন্দর্পকান্তি জোয়ান ছোকরা বাঁধবার মতন সোনার দড়ি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ফাইল-কেরানীর নেই।

গোল বাঁধল বাসরঘরে। পারুলের এক সঙ্গিনী গান গাইবার সেই বাধা পেল। বর হাত তুলে গান থামিয়ে দিল, ভাল ঠাকুর-দেবতার গান জানা থাকে তো গান, এসব গান ভাল লাগছে না।

সঙ্গিনীও খাপ্পা। আঁকা ভ্রু বাঁকা করে বলল, কেন এ গানটা কি দোষ করল? 'সে যে কাছে এসে বসেছিল তবু জাগিনি?'

—কি দোষ করল বলতে পারব না, তবে সব মানুষের রুচি তো সমান নয়। এ ধরনের গান আমার ভাল লাগে না।

পিছনে চাপা হাসি, টিটকারি। বাঁকা-বাঁকা কথা।

ঘোমটা-ঢাকা মুখ, তবু পারুলের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। বান্ধবীদের কথার টুকরো আগুনের ফুলকির মতন জ্বালা ধরিয়ে দিল বুকে।

—যেমন চেহারা, তেমনি সাজগোজ, আবার রুচির বড়াই!

—দেখ না পারুল, মাথায় হাত দিয়ে, ভটচায মশাইয়ের টিকি খাড়া হয়ে উঠেছে কিনা এ সব গান শুনে!

কে একজন হারমনিয়ম ঠেলে দি বরের দিকে, ও মশাই, এ সব গান থাক, আপনি একটা শিবস্তোত্র শোনান না হয়।

বর হারমনিয়ম ছুঁল না। ওম হয়েই বসে রইল। কিন্তু বাসর আর জমল না। ছুতো করে সবাই উঠে গেল একজন একজন করে। ঘর ফাঁকা হতেই বর হাত দিয়ে সতরঞ্চ ঝেড়ে শুয়ে পড়ল বালিশে মাথা দিয়ে। মিনিট দশেক। তারপরেই প্রগাঢ় ঘুম।

পারুল বসল দেয়ালে হেলান দিয়ে। যে মানুষটার পাশাপাশি বসে এই অল্প সময়ের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে সারাটা জীবন ঘর করতে হবে ভাবতে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে উঠল। কাঠখোট্টা লোক। রস কস নেই। পড়া-না-পারা ছেলের মতন কথায় কথায় হয়তো কেবল ধমকই দেবে। তেমন কিছু হলে বেতই হয়তো চালাবে পিঠের ওপর।

আগামী দিনের সেই যন্ত্রণাতেই যেন পারুল শিউরে উঠল।

শহরতলী কুসুমপর। কুসুম বলতে ডালিয়া ক্রিসান্থিমাম নয়, আকন্দ আর ঘেঁটু ফুল। এঁদো ডোবা, কচুরিপানার আস্তরণ, বেউড় বাঁশের ঝোপ। পাশাপাশি অবশ্য হালফ্যাসানের 'দি বিউটি সেলুন' আর শিবরাত্রির সলতে বাজারের মাঝ বরাবর 'চাঁদিনী সিনেমা'। বদ্ধ খড়-খড়ি ঘোড়ার গাড়িতে আসতে আসতে পারুল উঁকি দিয়ে দেখল। শহরতলী না ছাই, অজ পাড়াগাঁ। মাটির দেয়াল আর টিনের ছাউনি। ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা কোঠা বাড়ি, জরাজীর্ণ, পাঁজরা-সার। সারাটা জন্ম বুঝি কাটাতে হবে এখানে! উঃ মাগো, বাসি তরকারি মুখে ঠেকিয়ে নরম ঘুলিয়ে ওঠার সামিল। বাপের বাড়ি বেলেঘাটা। নেই নেই করেও বাবার ছল আছে সেখানে। কল খুললে জল, সুইচ ছুঁলেই আলোর বন্যা। যাবে মানু তার কানাচে। কোনও অসুবিধা নেই। হরদম বাস চলছে

মিনিট অন্তর। দুরাত পাকলে। নয়তো এমন কুসুমপুরে তার ...
বর জিয়োন ছিল, কে জানত। পাঁচঘণ্টা রেলে কাটানর পরও, ঘোড়ার
গাড়িতে আড়াই মাইল পথ। তাও আয়না-চকচক অ্যাসফাল্ট-ঢাকা
রাস্তা নয়, খোয়া-ওঠা, ইটের শিরা বের করা কাঁকর-প্রকট এবড়ো
খেবড়ো শড়ক।

কুসুমপুর হাইস্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। মানুষটার নাম একটা ছিল ...
কি, কিন্তু সে নাম ধরে কেউ আর ডাকেও না। সবাই সেকেণ্ড মাস্টার
বলেই জনে। পাড়াপড়শী থেকে দোকানদার, ভিনগাঁয়ের লোক পর্যন্ত।
সেকেণ্ড মাস্টারের সাজ-পোশাকের যেমন ছিরি, আস্তানার অবস্থাও
তথৈবচ। মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল। পিছনে মজা পুকুর, সামনে
উঠানের ফালি। আসবাবের মধ্যে নড়বড়ে তক্তপোশ আর একটা
হাতল-ভাঙা কাঁঠালকাঠের চেয়ার।

খিটিমিটি বাধল দিন পনেরোর মধ্যেই। নেলপালিশের শিশিটা
হাতে নিয়ে সেকেণ্ড মাস্টার জিজ্ঞাসা করল, এটা কি বস্তু ?

মেঝেয় বসে পারুল চুল বাঁধছিল। হাতে চিরুনি, দাঁতে কালো
ফিতে। ফিতে সরিয়ে চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, নখ-পালিশ।

—নখ-পালিশ ? তার মানে ? সাবান দিয়ে ঘষলে নখ তো যথেষ্ট
পরিষ্কার হয়।

—না, হয় না। সব জিনিস ঘষলেই চকচকে করা যায় না। যেমন
তুমি। হাজার পালিশ করলেও তোমার পাঁড়াগেঁয়ে ছোপ ...বার নয়।
কথাগুলো জিভের ডগায় এলেও পারুল নিজেকে সামলে নি... বিয়ের
কনে। মনে এলেও সব কথা বলা উচিত নয়। তা ছাড়া ...
বিয়েতে পাওয়া। ফুরিয়ে গেলে আবার কিনবে, এমন স...
...রা পেট ভাত-না-জোটা পরিবারে সস্তা পাউডার আর

া থাকলেও এসব বিলাসিতার অবকাশ ছিল না। তবু পাড়াপড়শী মবয়সী মেয়েদের কল্যাণে, নখ-পালিশই শুধু নয়, বিয়েতে ঠোঁট-াঙানো ঘামও উপহার পেয়েছিল। তামাটে গালকে গোলাপী করার ীন কারসাজি। রুজের ছোট বাক্স।

সেদিন সাবধানে এড়িয়ে গেলেও মাসখানেকের মধ্যেই পারুল আরো ড় বিপদের মুখোমুখি হল। বিকালে গা ধুয়ে তাকের ওপর স্নোর শিশি ামিয়ে পারুল অবাক। শিশি পরিষ্কার। ছিটেফোঁটাও নেই। তার দলে একরাশ ভাঙা আধভাঙা ঝিনুকের বোতাম। খটকা লাগল। াড়িতে একটি বাড়তি লোক নেই। বাইরের লোকের আমদানিও নেই। তবে? ঘরের মানুষ ঘরেই ছিল। বাইরের দাওয়ায় বসে ছেলেদের অঙ্কের খাতা দেখছিল এক মনে। পারুল জোরে জোরে পা ফেলে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। সেকেণ্ড মাস্টার একবার মুখ তুলে মুখ নামাল।

—আমার স্নো কই?

—ফেলে দিয়েছি। সেকেণ্ড মাস্টারের গলা চাপা, কিন্তু স্বরে দৃঢ়তার মিশেল।

—কেন ফেলে দিয়েছ? তুমি তো কিনে দাওনি? পারুল চৌকাঠেই চেপে বসল। হেস্তনেস্ত একটা করা দরকার। নরম মাটি পেলেই বেড়ালে আঁচড়াবে। কচি পাতাতেই ছাগলের লোভ!

—তুমি এমনিতেই যথেষ্ট সুন্দর, ওসব ছাই-পাঁশ মাখার কোন দরকার হয় না। এবার মুখ না তুলেই বলল। খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে।

নরম গলার স্বর। মন ভিজোবার প্রয়াস। আসল কথাটা এড়িয়ে যাবার ছল। খুকি নয় পারুল যে যেমন মোচড়াবে, তেমনি মুচকে যাবে মানুষের দরকার মতন। মন ভুলিয়ে নিজের জিদ বজায় রাখার

ফন্দি। অমন ন্যাকা নয় পারুল। সেকেণ্ড মাস্টারের কথা শেষ হবার আগেই খিঁচিয়ে উঠল।

—থাক্, থাক্, ন্যাকামি কর না। কেন তুমি স্নো ফেললে জানতে চাই, কিনে দেবার যখন মুরোদ নেই—মাঝখানেই পারুল থেমে গেল। সেকেণ্ড মাস্টার মুখ তুলল। দুচোখে আগুনের হলকা। জোড়া-ভ্রু বেঁকে ধনুকের মতন। কপালে হিজিবিজি আঁচড়।

পারুল কথা আর শেষ করল না। চুপচাপ সরে এল ঘরের মধ্যে। কিন্তু মেজাজ খিঁচড়ে রইল। চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাবে সেকেণ্ড মাস্টার? নিজের ক্লাসের পল্‌কা ছাত্র পেয়েছে না কি? ধমকে নরম করবে! অন্যায় করে উল্টে গলাবাজি। মনে মনে পারুল মতলব ঠিক করে ফেলল।

দুপুরের দিকে দরজায় তালা লাগিয়ে পোদ্দারের দোকানে গিয়ে দাঁড়াল। বিয়েতে পাওয়া দুটো আংটির একটি কেশবের হাতে তুলে দিয়ে বলল, কত দিতে পারবে বল তো?

কুসুমপুর এমন কিছু বড় জায়গা নয়। পাশ ফিরতে গেলেই একজনের সঙ্গে আর একজনের গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি। তা ছাড়া সেকেণ্ড মাস্টারকে সবাই চেনে। আগুন-পারা মানুষ। কোন অধর্মে নেই, বদখেয়ালেও নয়। সাচ্চা লোক। পারুল যে তারই পরিবার এটাও কারুর অজানা নয়।

অনেক দর-কষাকষির পর দশটাকায় রফা। টাকা কটা আঁচলে বেঁধে পারুল বাজারের মনিহারি দোকানে গিয়ে উঠল। সব জিনিস অবশ্য পাওয়া গেল না। তবে ঠিক হল বাকি জিনিস কটা শহর থেকে দু একদিনের মধ্যেই আনিয়ে দেবে। কষ্ট করে পারুলকে আর দোকানে আসতে হবে না। দোকানির ভাগ্নে বাড়ি বয়ে পৌছে দিয়ে আসবে।

পারুল একটু ভয়ে ভয়েই ছিল। অমন মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। টান মেরে শুধু শিশিগুলোই উঠানে ফেলবে না, সেই সঙ্গে হয়তো ঘরের বউকেও। তবু পারুল নিজের জিদ বজায় রাখল। এখন থেকে মাথা নিচু করলে এরপর আর মাথাই তোলা যাবে না। খড়ম-শুদ্ধ পা হয়তো পারুলের খোঁপার ওপরেই তুলে দেবে। কপাল ঘষে দেবে দাওয়ার মাটিতে।

কিন্তু আশ্চর্য, স্কুল-ফেরত সেকেণ্ড মাস্টার ঘরে পা দিয়েই একটু থমকে দাঁড়াল। প্রথমে তাকের ওপর রাখা শিশি আর কৌটোগুলোর ওপর আলতো নজর, তারপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেরাল পারুলের দিকে। রঙের ছোপ দু গালে, পাতলা ঠোঁটে, নখের কোণেও। ভ্রুতে আর দু চোখের কোণে কাজলের টান।

মিনিট দুয়েক। তারপরই আলনা থেকে গামছা পেড়ে নিয়ে ধীর পায়ে খিড়কির পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল। খুব আস্তে, মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

সেকেণ্ড মাস্টার প্রতিশোধ নিল অন্যভাবে। আগে খদ্দরের জামা পরত—না পাঞ্জাবি না ফতুয়া, মাঝামাঝি ধরনের অঙ্গাবরণ। কিন্তু পরের দিন থেকে একেবারে খালি গা, বাইরে বেরবার সময় শুধু আলগোছে একটা খদ্দরের চাদর। সপ্তাহে দুদিন ক্ষুর ছোঁয়াত দাড়িতে। নিজে নয়, জগবন্ধু নাপিতের মারফৎ। এবার সে পাটও তুলে দিল। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ির বাহার। এও পারুল সহ্য করেছিল চোখকান বুজে। কিন্তু সেকেণ্ড মাস্টার সিঁড়ি বেয়ে আরো এক ধাপ ওপরে উঠল। সন্ধ্যার ঝোঁকে বাড়িতেই ছাত্র পড়ান আরম্ভ করল। ছাত্র জন চারেক, কিন্তু সেকেণ্ড মাস্টারের ভারিক্কি গলার আওয়াজে সারা বাড়ি গমগম।

বিলাসিতার ওপরে ওজস্বিনী বক্তৃতা, মানুষের দ্রুত অধঃপতনের মূল

কারণ যে তাই, সে বিষয়ে উদাহরণসমেত জ্বালাময়ী ভাষণ। অন্তঃসারশূন্য নারীরাই ধার-করা রঙে নিজেদের সাজায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

ছাত্ররা ঢুলত বটে, কেউ কেউ সেকেণ্ড মাস্টারের অন্যমনস্কতার সুযোগে স্লেটের ওপর আঁকিবুঁকি কাটত, কিন্তু উনানে পাখা নাড়তে নাড়তে পারুল কান খাড়া করে রাখত। কথামৃতের একটি অক্ষরও বাদ না যায়, বক্তৃতার একটি বর্ণও না ফসকায়। মাঝে মাঝে পাখার বাঁট নিয়ে তেড়ে আসার সদিচ্ছা হলেও, পারুল সে ইচ্ছাকে কোনদিন প্রশ্রয় দেয়নি। অনেকক্ষণ পরে যখন খেয়াল হ'ত তখন নিজের চোখের জলে সযত্নে মাখা রুজ আর পাউডার ভিজে একশা। কাজল আর ঠোঁটের রং ধুয়েমুছে একাকার।

অনেকদিন অন্তর পারুলের বাবা আসেন। কোন কোন দিন হাতে মায়ের তৈরি গজা, কিংবা দোকানের কেনা মিষ্টি। বেশির ভাগ দিনই খালি হাতে, বিশেষ করে মাসের শেষ দিকে। জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় কালে ভদ্রে। বাড়ির বাইরে থাকলে তো কথাই নেই, দাওয়ায় ছেলেদের নিয়ে বসে পড়াতে থাকলেও একবার শুধু উঠে সেকেণ্ড মাস্টার শ্বশুরকে প্রণাম করে। ব্যস ওই পর্যন্ত। কোন কথাবার্তা নয়, কুশল প্রশ্ন তো চুলোয় যাক।

কথাবার্তা পারুলই বলে। পাড়াপড়শীদের খোঁজখবর, এ কথা সে কথা। মার শরীরের অবস্থা, বোনের বিয়ের চেষ্টা-চরিত্র। কিন্তু জামাইয়ের কথা একটিবারও বলে না। একবার শুরু করলে পারুল নিজেকে আর চাপতে পারবে না। গায়ের ঝাল মিটিয়ে খুঁটিনাটি সব বলে ফেলবে। রাগের ঝোঁকে মাথাই ঠুকবে বাপের পায়ে। কেন কলকাতার গঙ্গায় কি জলের কমতি ছিল, বেলেঘাটার খালও তো

শুকনো নয় ! পারুলের গলায় পাথর বেঁধে ঠেলে ফেলে দিলেই হত। এমন মানুষের সঙ্গে ঘর করতে হত না।

ব্যাপার পারুলের বাবা যে কিছুই বোঝেন না, এমন নয়। সব বুঝেও বোকা সেজে থাকেন। এ ছাড়া উপায়ই বা কি ! স্বামী-স্ত্রীতে মন কষাকষি এর পরমায়ু আর কতদিনের ! শরতের মেঘের মতন এই আছে, এই নেই। তবুও ওঠবার সময় শেষ চেষ্টা। সীতা-সাবিত্রীর কাহিনী। উমা-মহেশের উপাখ্যান। রসিয়ে রসিয়ে শোনান পতিব্রতাদের কীর্তি।

পারুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের নখ খোঁটে মাথা হেঁট করে।

এতদিন একেবারে একলা। বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত আসার পাট নেই। পড়শীরাও উঁকি মারে না। পারুল যেন হাঁপিয়ে ওঠে। কথা বলার মানুষ নেই, সময় কাটাবার কোন উপকরণও নেই। বাড়ির লোকের সঙ্গে সারাদিনে বড় জোর দু-একটা কথা। তাও খাওয়া-দাওয়া গাড়ু-গামছা সম্বন্ধে। বান্ধবীদের মুখে পারুল শুনেছে, বিয়ের পরের একবছর হাঁসের পালকের মতন হালকা। লঘুছন্দে ভেসে ভেসে বেড়ায়। কেবল দুজনের অশ্রান্ত কূজন। দিনরাত সবই সমান।

বুক ঠেলে পারুলের নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। ছেলেদের অঙ্কের খাতা হলে তবু দেখত উল্টে পাল্টে। কোলের ওপর টেনে একমনে চোখ বোলাত। কিন্তু ঘরের বৌয়ের দিকে একবার ফিরেও চায় না। বিশেষত সেই ঘটনার পর। জানালার ধারে বসে পারুল দিনের পর দিন কাটায়। মাঝে মাঝে জিনিস আনার ছল করে দোকান-ফেরত এধার-ওধার ঘুরে আসে।

এতদিন পরে দোসর মিলল। মনের মতন। পালেদের মেজ-বৌ ভাবিনী। স্বামী কাঁচা পয়সার মালিক। চামড়ার কারবার। সেই জন্যই শহরতলীতে বাস। ছেলে নেই, পুলে নেই, শুয়ে বসে ভাবিনীর আর দিন কাটে না। হাই তুলে তুলে চোয়াল ব্যথা। গলায় তিন্ ছড়া হার, সাড়ে তিনপ্যাঁচের অনন্তর চাপে হাত তোলাই দায়। দশ আঙুলে আটটা আংটি, হরেক রকম পাথরের কারসাজি।

পারুল সাবান নিয়ে দোকান থেকে ফিরছিল, ভাবিনীদের দোর দিয়ে। ছায়া দেখে একটু দাঁড়িয়ে আঁচলে ঘাম মুছছিল, ভাবিনী ডাকল, ও মেয়ে শুনছ?

পারুল শুনেছিল, এবার মুখ ফেরাল।

প্রথমে খোঁজ-খবর, আলতো আলাপ, স্বামীর কথা, বাড়ির এত্তেলা, তারপর জর্দার-ছিটে-দেওয়া পান মুখে দিয়ে একগাল হাসি, ওমা, এত কাছে থাক ভাই, অথচ এতদিন আলাপ হয় নি? আলাপ হবেই বা কি ভাই। বাতের যন্ত্রণায় মরে আছি। নড়বার চড়বার জো নেই। এ অজ পাড়াগাঁয়ে দু-একটা কথা বলব, এমন মানুষ পাই না। ভালই হল ভাই, আলাপ যখন হল তখন মাঝে মাঝে আসবে।

সেই শুরু, প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে, তারপর প্রায় প্রত্যেকদিন দুপুরে। সেকেণ্ড মাস্টার বেরিয়ে গেলেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে পারুল বেরিয়ে পড়ে। ফেরে অবশ্য স্কুল ছুটি হবার আগেই।

কথাটা ভাবিনী-ই পাড়ল। দিন পনেরো বাতের ব্যথাটা একটু কম। উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওপর নিচে করার পক্ষেও কোন অসুবিধা নেই। একদিন সময় করে পারুলকে নিয়ে কাছের মনিহারি দোকানেও ঘুরে এল।

আজ অবশ্য অন্য ব্যাপার। ভাল বই হচ্ছে "চাঁদিনী"তে। যাবে নাকি?

ভাবিনীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পারুল হিসাব শুরু করল। আঁচলে বাঁধা তিন আনা পয়সা। বাড়িতে চায়ের কাপ ঢাকা আনা দশেক। মাসের আজ মোটে তেরোই। অর্ধেকের ওপর বাকি। কিন্তু ভাবিনীর পরের কথাতেই পারুলের ভাবনার মেঘ কেটে গেল। টিকিট কেনার বালাই নেই। "চাঁদিনীর"র মালিক ভাবিনীর কর্তার খুব জানাশোনা। তাছাড়া ওদের ব্যবসার বিজ্ঞাপনের স্লাইড আছে ওই সিনেমায়। যখন যে শো ইচ্ছা গেলেই হল। তাও দামী আসনে।

তবু পারুল একটু ইতস্ততঃ করল। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, দুদিনের জানা, সেই সুবাদে পারুলের যাওয়া কি ঠিক। ভাবিনী যেতে পারে একশবার কিন্তু তার আঁচলের খুঁট ধরে ধরে সে যাবে কেমন করে।

কথাটা মুখ ফুটে বলতেই ভাবিনী চেঁচিয়ে উঠল। হাতমুখ নেড়ে চিৎকার। পর মনে করে পারুল, তাই এমন কথা বলতে পারল। নয়তো দিদির সঙ্গে যাবে তাতে আবার লজ্জা সরম কিসের! বেশ গিয়ে দরকার নেই পারুলের, ভাবিনীও যাবে না।

অগত্যা যাওয়া ঠিক হল। বিনাপয়সায় দেখাই শুধু নয়, বিনা পয়সায় লেমনেড আর পান। কোন ওজর চলল না। মালিকের ভাই তারাচরণ, অবশ্য আপন নয়, দূর সম্পর্কের। নিজে পাশে দাঁড়িয়ে খাওয়াল।

একমাথা কোঁকড়ান চুল, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, ফুল-কোঁচা, ফিতেছাড়া চিনে বাড়ির জুতো। হেসে হেসে কথা বলে, চোখ দুটো টুনটুনি পাখির মতন সর্বদাই নাচছে। ভারি আমুদে মানুষ।

আরও আশ্চর্য হয়ে গেল পারুল। ছবিতে যারা নড়েচড়ে হাসে-কাঁদে, তাদের সঙ্গে তারাচরণের নাকি খুব আলাপ। রক্তমাংসের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে দহরম-মহরম। পারুল বিস্ময়ে নিজের চোখ দুটো বড় করে ফেলল। এই অজ পাড়াগাঁয়ে এমন মানুষ ছিটকে এল কোথা

থেকে! পারুল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ফাঁক পেলেই যায় ভাবিনীর সঙ্গে "চাঁদিনী" সিনেমায়। এক বই দেখে একাধিকবার। চেনা লোক তারাচরণ রয়েছে, কিসের অসুবিধা। একটু একটু করে পারুলের সাহস বাড়ল। শুধু পারুলেরই নয়; প্রথম প্রথম লেমনেড, রাংতামোড়া পানের খিলি, ক্রমে ক্রমে সাহস তারাচরণেরও বাড়ল।

ভাবিনী একটু এগিয়ে যেতেই তারাচরণ পারুলের হাতে একদিন একখানা সিল্কের রুমাল গুঁজে দিল। ভ্রূ কুঁচকে পারুল আপত্তি জানাতেই তারাচরণ মুচকি হাসল। মৃদু গলায় বলল, ছি, ও রকম করবেন না, রুমাল ফিরিয়ে দিলে মনে ভারি কষ্ট পাব।

তারাচরণ মনে কষ্ট পাবে বলে যে রুমাল ফেরত দেয় নি পারুল, এমন নয়, রুমালটা তার সত্যিই খুব ভাল লেগেছিল। বাড়ি ফিরে হ্যারিকেনের আলোয় অনেকবার নেড়েচেড়ে দেখেছে। ঘাস-সবুজ জমি, কমলা রঙের বর্ডার। পাখির বুকের মতন তুলতুলে। এত বড় রুমাল, অথচ গুটিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে নেওয়া চলে। না, পছন্দ আছে তারাচরণের।

পাশাপাশি আর একজনের পছন্দের কথা মনে পড়ে গেল। বলে বলে মুখ বোধ হয় পচে গেছে। শেষকালে শতচ্ছিন্ন ব্লাউজটা ছুঁড়ে ফেলেছে সেকেণ্ড মাস্টারের সামনে। গজগজ করেছে। আটপৌরে ব্লাউজ একটিও নেই। এরপর বিয়েতে পাওয়া কিছু দামী ব্লাউজগুলোই পারুল ব্যবহার করতে শুরু করবে। নয় তো শরীরের ওপর শুধু শাড়ি জড়িয়েই ঘোরাফেরা করবে এধার ওধার। সেকেণ্ড মাস্টারের সম্মান বাড়বে তাতে!

সেকেণ্ড মাস্টার একটি কথাও বলে নি। দিন দুয়েক পর তিন মাইল দূরের হাট থেকে ব্লাউজ কিনে এনেছে। কালো জমির ওপর বেগুনী ফুলের ছিটে। সস্তা জ্যালজেলে কাপড। পুকুরে ছড়িয়ে দিলে

বোধ হয় খয়রা-চাঁদা আর সরল পুঁটি ধরা পড়ে। ঝি-চাকরেও এমন জিনিস ছোঁয় না! বলিহারি পছন্দ!

পারুল রেগে আগুন।

—রেখে দাও, তোমার একটা ফতুয়া করে দেব ওটার সেলাই খুলে। যেমন চেহারা তেমনিই তো হবে পছন্দ! তক্তপোশে শুয়ে শুয়ে পারুল ঝাল ঝাড়ল।

একটি কথাও নয়। সেকেণ্ড মাস্টার উঠে ব্লাউজ হাতে নিয়ে তখনই বেরিয়ে গেল। আধ ঘণ্টা পরে ফিরল, খালি হাতে।

তারাচরণ সত্যিই বাড়াবাড়ি শুরু করল। শুধু রুমাল নয়, ফাঁকে ফাঁকে স্নো, এসেন্স, কিউটেক্স হাতে তুলে দিল। 'চাঁদিনী' সিনেমার আলো-অন্ধকার ঘরে নয়, একেবারে বাড়ি অবধি ধাওয়া করল।

প্রথম দিন সেকেণ্ড মাস্টার বেরিয়ে যাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে। মাথায় গায়ে তেল মেখে গামছা হাতে সবে পারুল পুকুরে নামবার আয়োজন করছে, এমন সময় দরজায় শিকল নাড়ার আওয়াজ। পারুল ফিরল। নির্ঘাত সেকেণ্ড মাস্টার ফিরে এসেছে। ছাতি ফেলে গেছে কিংবা পড়ানর কেতাব। আচ্ছা জ্বালাতন!

দরজা খুলেই পারুল লজ্জায় জড়সড়। ছি, ছি, উটকো লোকের সামনে এমনি বে-আব্রু অবস্থা। গায়ে মাথায় কাপড়ের ঠিক নেই। তেল-জবজবে শরীর।

গামছা দিয়ে শরীরটা ঢেকে নিয়ে পারুল হাসল, কি খবর?

—খবর তো আপনার কাছে। তারাচরণ এগিয়ে এসে চেয়ার চেপে বসল।

—আমার কাছে? পারুল ভ্রূ তুলল।

ফিটফাট পোশাক। কোঁচান ধুতি অর্ধেকটা লুটাচ্ছে মাটিতে।

দামী ছিটের সার্ট। নীল রংয়ের ব্লেজার। চওড়া কলার, হাতে রোদ আটকাবার সবুজ চশমা। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেণ্টের যে সুরভি পারুলের নাকে গিয়েছিল সেটা এখনো বাতাসে ভাসছে। পরিচিত গন্ধ। সৌখিন তারাচরণ এই একটি সেণ্টই ব্যবহার করে। উগ্র নয়, মদির সুবাস। নেশা ধরায়।

—আজকাল সিনেমায় যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। ভাবিনীদি তবু গেছেন দুএকবার, আপনি তো একেবারেই ডুব।

কথাটা সত্যি। দিন পনেরো পারুল আর ওদিক মাড়ায় নি। শরীরটাও ঠিক ছিল না, তার ওপর সেকেণ্ড মাস্টারের সঙ্গেও খিটিমিটি চলেছে সংসারের খরচ নিয়ে। ইস্কুল মাস্টারের বৌকে ঠিক ইস্কুল মাস্টারের বৌয়ের মতনই থাকতে হবে—সাজপোশাকে, আচার-ব্যবহারে। বাড়তি রোজগারের আশা যেখানে নেই, বাড়তি খরচ করা সেখানে নিশ্চয়ই অনুচিত। কিন্তু এসব কথা তো আর বাইরের লোককে বলা যায় না। বিশেষ করে তারাচরণের মতন মানুষকে! গামছা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে পারুল ম্লান হাসল।

—বেরবার সময় পাচ্ছি না। ভাবিনীদির বাড়িতেও কদিন যেতে পারিনি।

বুকপকেট থেকে রঙিন রুমাল বের করে তারাচরণ ঘাড় আর কপালের কল্পিত ঘাম মুছে নিল! এদিক ওদিক চেয়ে বলল, তার আর আশ্চর্য কি! বিরাট সংসার, একপাল কাচ্ছা-বাচ্ছা। সময় পাবেনই বা কি করে!

—আহা, লোকজন না থাকলেই বুঝি আর কাজ থাকতে নেই। ঝাড়ামোছা কাচাকাচি, সবই তো এক হাতে করতে হয়। নিশ্বাস ফেলার সময় আছে! চোখে মুখে পারুল বিব্রতভাব ফুটিয়ে তুলল। সংসারে নানা ঝামেলায় যেন নাজেহাল।

তারাচরণ পা নাচাতে নাচাতে মুচকি হাসল। পারুল থামতে ফিসফিসিয়ে বলল, মাস্টারমশাইকে বলুন না, একটা ঝি রেখে দেবে। এ কচি বয়সে এত খাটতে যাবেনই বা কেন?

চেষ্টা করেও পারুল নিশ্বাস চাপতে পারল না। নিশ্বাসের ছন্দে যৌবনপুষ্ট বুক দুলে উঠল। চোখের কোণে জলের ইসারা। এমনি লোক কিনা সেকেণ্ড মাস্টার। মুখের কথা খসালেই অমনি হাজার দাসী-চাকর এনে দেবে। সুখের পরিসীমা থাকবে না!

ব্যাপার দেখে তারাচরণ কথা ঘোরাল। এদিক ওদিক চেয়ে মোলায়েম গলায় বলল, আজ নতুন বই এসেছে 'চাদিনী'তে। সে কথা বলতেই নিজে এলাম।

—নতুন বই?

—হ্যাঁ, 'আলোর মায়া'। ছন্দা দেবী রয়েছে।

তারাচরণের মুখেই পারুল শুনছে। অদ্ভুত বই হয়েছে, বিশেষ করে ছন্দা দেবীর অভিনয়। শহরে ছবিটা তারাচরণ দেখে এসেছে। এমন বই সচরাচর হয় না। জাঁদরেল অভিনেতার দল। বই তুলতে ছ'লাখের ওপর খরচ হয়েছে। যেমনি সিন-সিনারি, তেমনি সাজ-পোশাক। অনেকদিনের আশা পারুলের। এই বই না দেখলে জীবনই বৃথা।

—বেশ তো ভাবিনীদিকে বলুন না!

—আরে সেখানে তো আগে গিয়েছিলাম। ভাবিনীদি বাপের বাড়ি। তাই ছুটতে ছুটতে আপনার কাছে আসছি। মোটে তিনদিন থাকবে ছবিটা। বহু কষ্টে আনা হয়েছে। আজ দুপুরেই চলুন না।

আপত্তি নেই পারুলের। এর আগে আরো কয়েকবার দুপুরে গিয়ে সেকেণ্ড মাস্টার ফেরবার আগে চলে এসেছে। জানাজানি হয় নি। কিন্তু আজ আর-এক মুশকিল। সেকেণ্ড মাস্টার বলে গেছে দুপুরেই

ফিরবে। কোথায় মাস্টারদের কি এক সভা আছে। কলকাতা থেকে এক পণ্ডিত আসবেন, শিক্ষকদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে। সকাল থেকে সেকেণ্ড মাস্টার উপুড় হয়ে পড়ে খসখস করে কি সব লিখেছে। উঁকি দিয়ে পারুল দেখেছে। প্রশস্তিপত্র আর শিক্ষার বিবিধ সমস্যার ফিরিস্তি।

মনে মনে পারুল একবার হিসাব করে নিল। অসুবিধা আর কি। যদি আসে সেকেণ্ড মাস্টার, তার পৈতায় বাড়তি চাবি তো বাঁধাই আছে। সেই চাবি দিয়ে তালা খুলবে।

আর পারুলের বাড়ি না থাকার কৈফিয়ৎ! ভয় কিসের! সারা দিন-রাত সেকেণ্ড মাস্টারের ঘর আগলে বসে থাকবে, বিয়েতে এমন কিছু চুক্তি ছিল না। একটু নড়বে না মানুষ। এদিক ওদিক যাবে না। নিজের সুখ-সুবিধা, নিজের জীবন বলে কিছু থাকবে না। অপরিসর অন্ধকার ঘরে বাইরের আলোবাতাস আসবার সব জানালা-দরজা বন্ধ করে কখনো বাঁচতে পারে লোক? হাঁপিয়ে উঠবে না!

যদি জিজ্ঞাসাই করে কিছু একটা বলে দিলেই হবে!

• —বেশ আপনি গেটে থাকবেন, আমি ঠিক সময়ে যাব।

—যদি বলেন তো আমি এসেও নিয়ে যেতে পারি। তারাচরণ উঠে দাঁড়াল।

—না, না, পারুল হাত নাড়ল, এইটুকু তো রাস্তা, কাউকে নিয়ে যাবার দরকার হবে না।

রাস্তা হয়তো এইটুকু, লোকের কিন্তু কমতি নেই। সেকেণ্ড মাস্টারের বউ "চাঁদিনী" সিনেমার লোকের পাশাপাশি হেঁটে গেলে কথা উঠবে। ড্যাবড্যাব করে লোক শুধু চেয়েই থাকবে না পল্লবিত করে নানা কথা ছড়াবে। বিশ্রী সব কাহিনী, সত্যমিথ্যায় মেশানো। লোকের মুখে মুখে সেকেণ্ড মাস্টারের কানেও উঠবে কথা।

তার চেয়ে পারুল একলাই যাবে। তাতে লোকের চোখ টাটাবে না।

—ঠিক আসবেন তাহলে আমি অপেক্ষায় থাকব। তারাচরণ আবার রুমাল বের করল। কপাল আর ঘাড়ের দুপাশ মুছে নিল। ভুরভুর করছে গন্ধ। সেকেণ্ড মাস্টারের ছোট ঘর ভরে উঠল।

নমস্কার। দুহাত জোড় করে তারাচরণ উঠানে নামল।

পাল্টা নমস্কার করতে গিয়ে বিপত্তি। গামছা কাঁধ থেকে পড়ে গেল। নিচু হয়ে কুড়তে গিয়েই আরও অপ্রস্তুত অবস্থা। লজ্জায় লাল হয়ে পারুল গামছা তুলে নিয়ে কাপড় ঠিকঠাক করে যখন উঠে দাঁড়াল, তখনও তারাচরণ ঠিক একভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস। কপালে ঘামের ফোঁটা। দুচোখ লালসামেদুর। চোখাচোখি হতেই তারাচরণ চলে গেল জোরে জোরে পা ফেলে।

দরজায় হাত দিয়ে পারুল অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কেবলই চোখের সামনে ভাসতে লাগল তারাচরণের মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি। বিয়ের আগে পথ চলতে চলতে দু-একবার এমনই দৃষ্টির সামনাসামনি হয়েছে। পাড়ার ছেলেদের। নিজের চেহারা সম্বন্ধে পারুল খুবই সজাগ। শক্ত সমর্থ শরীর আর রঙের জেল্লা। আশ্চর্য, বিয়ের পরে সেকেণ্ড মাস্টার বোধ হয় ভাল করে চেয়েও দেখেনি একবার। অথচ এই তো ঘরের পরিধি। চোখের সামনে দিয়ে অনবরত পারুল চলাফেরা করছে। ওঠা, বসা, নাওয়া, খাওয়া সবই।

কথাটার আর-একটা দিকও পারুল ভাবে। ওই তো চেহারার ছিরি। কুতকুতে চোখ, চ্যাপ্টা নাক, একজোড়া রক্তচোষা জোঁকের মতন দুটি ঠোঁট। ঘোলাটে চাউনি দিয়ে চাইলেই পারুলেরই গা ঘিন ঘিন করত। অতর্কিতে বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস। একদিন দুদিন নয়, রেলের কামরায় উটকো লোকের সঙ্গে একটা রাত কাটানো নয়, সারা জীবন ঘর করতে হবে এমন একটা মানুষের সঙ্গে।

হাতে সময় বেশী নেই। পারুল তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে নিল। দেয়াল থেকে আয়না পেড়ে নিয়ে হাঁটু মুড়ে সামনে বসল। পিঠ ছেয়ে কালো কোঁকড়ানো চুলের রাশ। চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে পারুল হাঁপিয়ে উঠল। যত্ন করে খোপা বাঁধল। এদিকে ওদিকে চেয়ে আয়নায় খোঁপার ছায়া দেখল। তারপর সাজের পালা। শাড়ির সংখ্যা এমন কিছু নয়, কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পারুল দশবার দেখল। শেষকালে ময়ূরকণ্ঠী শাড়িটাই বেছে নিল। মনে পড়ছে, বিয়েতে বাড়িওয়ালার বৌ উপহার দিয়েছিল। যতটা চটকদার, ততটা দামী নয়, কিন্তু আধো অন্ধকারে ভালই দেখাবে। তারাচরণের মুগ্ধ দৃষ্টি আটকে থাকবে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে।

প্রসাধন শেষ করে দাঁড়িয়ে উঠেই পারুল চমকে উঠল। রোদ সরে গেছে পাঁচিলের ওপর। কুলতলায় রোদের ছিটেফোঁটাও আর নেই। দেরি হয়ে গেছে। এইবেলা বেরিয়ে পড়তে না পারলে ঠিক সময় পৌছানো যাবে না।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়েও পারুল ঠিক সময়ে পৌছাতে পারলে না। ছবি শুরু হয়ে গেছে।

গেটের কাছেই তারাচরণের সঙ্গে দেখা। দুহাত পিছনে রেখে বেচারী পায়চারি করছিল। চোখ অবশ্য রাস্তার দিকে।

পারুলকে দেখেই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল, বেশ লোক যাহোক, এত দেরি করে মানুষে। ঝাড়া একঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা টন টন করছে।

পারুল মুচকি হাসল! ভ্রু কুঁচকে বলল, আহা!

—কি ব্যাপার বলুন তো? মাস্টারমশাই এসে পড়েছিলেন বুঝি?

পারুল হাসি থামাল না। হ্যাঁ মাস্টারমশাইকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আসছি।

তারাচরণ আর কথা বাড়াল না। ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল। শহরতলীর সিনেমা। একেবারে পিছনে গোটা চারেক দামী সিট। দেড় টাকা। তাও লোক হয় না। কালে ভদ্রে চাঁদিনী সিনেমার মালিক বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসেন। দুধারে কালো পর্দা টাঙানো। আভিজাত্যের আব্রু।

সিটে পারুলকে বসিয়ে তারাচরণ বাইরে বেরিয়ে এল। অন্য দিনও তাই করে। ভাবিনী আর পারুলকে বসিয়ে নিজে চলে আসে। মাঝে মাঝে তদ্বির তদারক।

আসল ছবি শুরু হয়নি। কোন্ দেশের মেয়েদের কি এক উৎসব উপলক্ষে নাচের ছবি দেখান হচ্ছিল। কোমর ধরে ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত নাচের ভঙ্গী।

দেখতে দেখতে খস করে শব্দ হতেই পারুল মুখ ফেরাল। ওদিকের কালো পর্দাটা কে বুঝি টেনে দিল। তারপর তারাচরণের সঙ্গে চোখাচোখি হল।

পর্দা সরিয়ে অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে আসছে।

এই নিন, তারাচরণ হাতটা বাড়িয়ে দিল।

অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে আসাতে পারুল বুঝতে পারল কলাপাতার ঠোঙায় তারাচরণ পান এনেছে। অন্য দিনের মতনই।

পান দিয়ে অন্যদিনের মতন কিন্তু তারাচরণ সরে গেল না। পাশের চেয়ারে বসল। আলো-অন্ধকারে অস্পষ্ট মানুষটির কাঠামো। মদির মনমাতানো সুরভি। চুল থেকেও দামী তেলের গন্ধ। ফিটফাট কেতাদুরস্ত মানুষ।

আসল ছবি শুরু হবার আগে আলো জ্বলে উঠতেই পারুল লজ্জা পেল।

তারাচরণ শুধু পাশেই এসে বসে নি, একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে

পারুলের দিকে। সে চোখের দৃষ্টির একটা মানেই হয়, আর সে মানে বুঝতে মেয়েদের এক তিলও সময় লাগে না।

পারুলের ভয় ভয় করল। আঙুলের ডগায় শিরশিরানি ভাব। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে উঠল। আজ হয়েছে কি তারাচরণের? অমন করে একদৃষ্টে চেয়ে দেখার কি আছে। একটু নড়েচড়ে বসে পারুল হাত দিয়ে মাথার ঘোমটা আলতো তুলে দিল। কেমন যেন ভয়-পাওয়া ভাল-লাগা ভাব। বুকের মধ্যে অশ্রান্ত দাপাদাপি।

—বাড়তি একটা পান থাকে তো দিন। তারাচরণ হাত বাড়াল।

আশ্চর্য লাগল পারুলের। এমনিতে অনেক সাধ্যসাধনা করেও তারাচরণকে পান খাওয়াতে পারে নি। ভাবিনী অনেক বলেছে, পারুলও। তারাচরণ ঘাড় নেড়েছে।

—না, পান খেলে অন্য কিছু খেতে পারি না। কেমন যেন ঘাস ঘাস লাগে। বসে বসে জাবর কাটা আমার সয় না।

পারুল হাসল, কি ব্যাপার আজ যে পান খাওয়ার এত ইচ্ছা? মতিগতি বদলাল দেখছি।

তারাচরণ কথা বলল না, কেবল হাতটা পারুলের দিকে আরো প্রসারিত করে দিল। কলাপাতার ঠোঙা খুলে পান দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তারাচরণ বলল, একটু চুণও দেবেন।

নিচু হয়ে চুণ দিতে গিয়েই বিপত্তি। হলের বাতি নিভে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আন্দাজ করে বহু কষ্টে পারুল আঙুলে চুণ ওঠাল কিন্তু হাতড়ে তারাচরণের হাত আর খুঁজে পেল না। আচ্ছা মানুষ তো, চুণ দেবার হুকুম করে বুঝি হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

—কই, এই যে চুণ, পারুল তারাচরণের দিকে ফিরে বলল।

তারাচরণ বুঝি এরই অপেক্ষায় ছিল। একটা হাত দিয়ে পারুলের

হাতটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে গেল তারপর চুণ নেবার ছুতোয় অনেকক্ষণ ধরে রইল আঙুল কটা।

পারুলের মনে হল সারা শরীরের রক্ত বুঝি মুখে এসে জমেছে। ঝিমঝিম করছে স্নায়ু আর শিরা। কথা বলতে গেলেও পারবে না কথা বলতে। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলেও পারবে না।

তারাচরণ হাত ছেড়ে দেবার পরেও এভাব কাটল না। কোলের ওপর হাতদুটো জড় করে পারুল চুপচাপ বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই কানের কাছে মৃদু গুঞ্জন। খুব কাছে। কানের লতিতে উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ।

— কেমন লাগছে ?

কেমন লাগছে। সামনে দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে সেলুলয়েডের রোল। রোমাঞ্চ-কাহিনী শুরু হয়েছে। নায়িকার পূর্বরাগের পালা। কিন্তু চোখ দিয়েই পারুল শুধু দেখে চলেছে! কিছু ঢোকেনি মাথায়। এত মাদকতা মানুষের স্পর্শে। অথচ ঘরের মানুষটার সঙ্গে হাজার ছুতোয় ছোঁয়াছুয়ি হচ্ছে। কিন্তু এমন হয় নি পারুলের। সে যেন দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়ান কিংবা বাসনকোশন ছোঁয়ার মতনই। নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ। কিন্তু একি দাহ। আলগোছে বিদ্যুতের তার ছোঁয়ার মতন সমস্ত শরীর ঝিনঝিন করে উঠে। মনে হয় চেতনাই বুঝি লোপ পাবে।

—কি চুপচাপ যে ? আলতো নাড়া কাঁধ ধরে। কিন্তু পারুলের মনে হল ওর মনের ভিত্তি ধরেই কে যেন সমূলে নাড়া দিল।

কিছু একটা বলা দরকার। একটা মানুষের প্রশ্নের উত্তরে মুখ বুজিয়ে বসে থাকা শোভনও নয়, উচিতও নয়।

—ভালই তো লাগছে। খুব ভাল। খুব মৃদুগলায় পারুল উত্তর দিল। তারাচরণের দিকে ঘাড় হেলিয়ে।

—কি ব্যাপার বলুন তো? সারাক্ষণ দেখছি কেমন মনমরা ভাব। আমি ডাকতে গিয়ে অন্যায় করেছি?

—না, না, অন্যায় কিসের। খুব জোরে পারুল মাথা নাড়ল। শুধু তারাচরণের মিথ্যা সন্দেহই নয়, নিজের আনমনা ভাবটাও উড়িয়ে দিতে চাইল।

—তবে একটাও কথা বলছেন না। সিনেমায় যেন মনই নেই।

—কে বলে মন নেই। শাড়ি ঠিক করে পারুল নড়েচড়ে বসল। হেসে বলল, ভাল লাগছে। বিশ্বাস করুন, খুব ভাল লাগছে।

—সত্যি। তারাচরণ একটা হাত বাড়িয়ে রুমাল শুদ্ধ পারুলের একটা হাত চেপে ধরল। ভিজে ভিজে হাত তারাচরণের। নিরুত্তাপ স্পর্শ। আগুন বুঝি নিভে গেছে।

পারুল এবার গলা একটু চড়াল, সত্যি সত্যি, সত্যি। এবার হয়েছে।

কোন উত্তর দিল না তারাচরণ কেবল হাত দিয়ে আরো চেপে ধরল পারুলের হাত।

হাত নয়, যেন ময়াল সাপ পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। শুধু হাত নয়, মনটাকেও যেন বেঁধে ফেলেছে পাকে পাকে।

অনেকক্ষণ পর, খুব আস্তে পারুল বলল। নিস্তেজ গলার স্বর। অতলে তলিয়ে যাওয়া মানুষের অসহায় কাকুতি।

—ছাড়ুন। হাত ছাড়ুন।

—যদি না ছাড়ি। তারাচরণের বলিষ্ঠ গলার আওয়াজ।

—কেন আপনি এমন-করছেন? কি করেছি আমি আপনার? চাপা কান্নার আওয়াজ; চেয়ারের হাতলে মাথা ঠেকিয়ে পারুল ফুঁপিয়ে উঠল। সযত্নে বাঁধা খোঁপা ভেঙে সারা পিঠে চুল ছড়িয়ে পড়ল।

একটা হাত ধরাই ছিল, তারাচরণ আর একটা হাত দিয়ে পারুলকে কাছে টেনে নিয়ে এল। খুব কাছে। মিনিট কয়েক কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। ঘোর কেটে গেলে পারুলের খেয়াল হল কখন সেও মাথা রেখেছে তারাচরণের বুকে। সুগন্ধভরা রুমাল দিয়ে তারাচরণ তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে সমস্তক্ষণ। পঙ্কিল জীবন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে নতুন জীবনে, নতুন পরিবেশে। কানে কানে বাঁচার মন্ত্র শোনাবে।

তাই শোনাল তারাচরণ। পারুলের মাথাটা বুকে চেপে খুব আস্তে বলল অস্পষ্ট গলায়। এঁদো ডোবা, অপরিচ্ছন্ন উঠান আর খড়ের চাল এইটুকু বুঝি জীবনের পরিধি। এইসব পার হয়ে নতুন দেশে ওরা চলে যাবে। নতুন জীবনে।

বাতি জ্বলে উঠতেই পারুল ঠিক হয়ে বসল। তারাচরণের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। আঁচল দিয়ে গাল আর মুখ মুছে মাথার ঘোমটা টেনে দিল।

ছবি শেষ, এবারে বাইরে যাবার পালা। চোখের সামনের ছবিগুলো দেখেনি পারুল কিন্তু মনের সামনের ছবিগুলো স্পষ্ট, রঙে রেখায় বিচিত্র।

উঠতে উঠতেই পারুলের মনেহল আবার ফিরে যেতে হবে সেকেণ্ড মাস্টারের ঘরে। মাপা জীবনযাত্রা, মাপা সুখদুঃখের সংসারে।

গেটের কাছ বরাবর এসে তারাচরণ ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে যেতে হবে নাকি ?

পারুল মাথা নাড়ল।

—আবার কবে দেখা হবে ?

এবার পারুল চোখ তুলল। রুজ চোখের জলে কখন ধুয়ে গেছে, তবু ডালিম-লাল দুটি গাল।

—কি করে বলব ?

এদিক ওদিক থেকে লোকের চাপ। খাবারওলাদের হাঁকডাক। ভিড় কেটে পারুল বাইরে চলে এল।

বাইরে এসেও নিস্তার নেই। কানের কাছে ঝিঁঝিঁর ডাকের মতন অবিশ্রান্ত গুঞ্জন। রঙীন জীবনের হাতছানি। শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সেন্টের সুরভি।

বাড়ির সামনে এসে পারুল একটু দাঁড়াল। দরজায় তালা লাগান। তালা খুলে তক্তপোশে গিয়ে বসল।

এদিক ওদিক চেয়েই পারুলের নজরে পড়ল। দড়ির আলনায় সেকেণ্ড মাস্টারের গায়ের চাদর। উঠে দাঁড়াল পারুল, তার মানে, সেকেণ্ড মাস্টার বাড়ি ফিরেছিল, চাদর রেখে আবার বাইরে বেরিয়েছে। দরজায় তালা দেখে হয়তো থমকে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাড়ির বৌ হুট হুট করে বাইরে বেরোবে, এটা সেকেণ্ড মাস্টারের মোটেই পছন্দ নয়।

সেকেণ্ড মাস্টারের পছন্দ! কথাটা মনে আসতেই পারুল নাক কোঁচকাল। আধ হাত ঘোমটা, তেল-জবজব খোঁপা, নাকে নোলক, পায়ে আলতা, বছর চোদ্দ বয়স, উঠতে বসতে স্বামীর পাদোদক পান করবে, ক্লান্ত স্বামীর গোদা গোদা পা কোলের ওপর টেনে নিয়ে সেবা করবে দিন রাত এমন একটি আন্নাকালী কিংবা সুহাসিনীই ঘরে আনা উচিত ছিল। ভুল করেছে সেকেণ্ড মাস্টার। হাত বাড়িয়ে মগডালের ফুল ছিঁড়তে চেষ্টা করেছে। কাঁটার ঘায়ে সর্বাঙ্গ যদি ছড়ে যায়, তবে তা নিয়ে আক্ষেপ করার কোন মানে হয়!

সেকেণ্ড মাস্টার বাড়ি ফিরল সন্ধ্যার ঝোঁকে। সঙ্গে আরো দুজন লোক।

ঘরের ভিতর ঢুকল না। বাইরে দাওয়ায় বসল মাদুর পেতে। দরজার ফাঁক দিয়ে পারুল উঁকি দিয়ে দেখল। হাতমুখ নেড়ে সেকেণ্ড

মাস্টার কি বলছে। রোদে পুড়ে তামাটে রং অঙ্গার। সারা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ির সার, গায়ের ফতুয়া খুলে হাঁটুর ওপর রাখা।

পারুল ভ্রু বাঁকা করল। বুককাঁপানো দীর্ঘশ্বাস। ফিটফাট ধোপ-দুরস্ত তারাচরণের পাশে সেকেণ্ড মাস্টার যেন বাড়ির গোমস্তা কিংবা মুহুরী। চোখে অঁাচল চাপা দিয়ে পারুল আস্তে আস্তে সরে এল।

সেকেণ্ড মাস্টার যখন ঘরের মধ্যে ঢুকল তখন দেয়ালে হেলান দিয়ে পারুল তন্দ্রামগ্ন। খড়মের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল, গাড়ুর জোর আওয়াজে চমকে সে উঠে বসল।

সেকেণ্ড মাস্টার গামছা টেনে মুখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারুল জিজ্ঞাসা করল, কি, খেতে দেব?

—না, আহ্নিক হয় নি এখন। থমথমে গলার স্বর সেকেণ্ড মাস্টারের।

পারুল চোখ কুঁচকে দেখল। কি ব্যাপার? বাড়িতে ছিল না সে কথা সেকেণ্ড মাস্টার জিজ্ঞাসা করছে না যে? কৈফিয়ৎ তলব করছে না।

ঘণ্টাখানেক বাদে সেকেণ্ড মাস্টারকে খেতে দিয়ে পারুল কথাটা নিজে থেকেই পাড়ল। এমন চুপচাপ থাকার চেয়ে সোজা জেনে নেওয়াই ভাল। সারা দুপুর ঘরে একা একা না কাটিয়ে পাড়ায় দু-একজনের বাড়ি যাওয়া নিশ্চয় অন্যায় নয়। এতে সেকেণ্ড মাস্টারের মেজাজ গরম হলে পারুল নাচার।

তরকারি দিতে দিতে পারুল বলেই ফেলল, আজ দুপুরে একটু বেরিয়েছিলাম।

মাথা নিচু করে ভাত মাখতে মাখতে সেকেণ্ড মাস্টার বলল, জানি।

—দুপুরবেলা বাড়িতে এসেছিলে তো?

—হুঁ।

—ভাবিনীদির বাড়ি গিয়েছিলাম। কদিন ধরে দিদি চাকর দিয়ে ডেকে পাঠাচ্ছে। শরীর খারাপ। নিজে আসতে পারে না। তাই ভাবলাম, গিয়েই দেখা করে আসি একবার।

—ভাবিনীদির বাড়ি নয় চাঁদিনী সিনেমায় গিয়েছিলে। সঙ্গের লোকটিকে চিনতে পারলাম না।

চৌকাঠে বাজ পড়লেও বোধ হয় পারুল এত চমকে উঠত না। কিন্তু সামনে বসা মানুষটা নির্বিকার। মাথা হেঁট করে ভাতের গ্রাস মুখে দিচ্ছে। যেন কিছুই হয় নি। চোখ তুলে চাইবারও প্রয়োজন বোধ করল না।

দু-এক মিনিট। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে পারুল টাল সামলাল। ওঃ, এতদূর। সেকেণ্ড মাস্টার মাস্টারি ছেড়ে বুঝি গোয়েন্দাগিরি ধরেছে। ওৎ পেতে রয়েছে এদিকে ওদিকে। বৌয়ের গতিবিধির ওপর নজর। ছল করে হঠাৎ বাড়ি ফিরে আসা। হাতে-নাতে যাতে ধরতে পারে বৌকে।

পারুল কঠিন হল। কেন ভয়টা কিসের! সাধ-আহ্লাদ নেই মানুষের! উঠতি বয়সে কামনা-বাসনা পুড়িয়ে যোগিনী হবে? ঘরের লোক যদি না নিয়ে যেতে চায় বাইরে, পড়শীর সঙ্গে বেরোবে। তা বলে এ বয়সে সমস্ত শখ জলাঞ্জলি দিতে পারবে না।

পারুল হারানো কথার খেই ধরল।

—ভাবিনীদির দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় কাজ করেন ওখানে। সেই সুবাদেই যাওয়া। বইটাও ভালো।

ততক্ষণে সেকেণ্ড মাস্টার আসন ছেড়ে উঠে পড়েছে। খড়ম পায়ে গলিয়ে খিড়কি পুকুরের কাছ বরাবর। দু-একবার ঢেঁকুর তোলার শব্দ পাওয়া গেল। মুখ ধোয়ার আওয়াজ।

ভাতের থালা কোলে নিয়ে পারুল চুপচাপ বসে রইল। একটি

গ্রাসও মুখে তুলল না। আশ্চর্য মানুষ। সামান্য কৌতূহলও কি নেই? লোকটা আসলে কে জানবার ইচ্ছা!

সেকেণ্ড মাস্টার ঘাট থেকে ফিরে আসতেই পারুল উঠে পড়ল। পুকুরধারের তালগাছের গুঁড়ির ওপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

সিনেমা ভাঙার সময়ই দেখেছে বোধ হয়। পাশাপাশি দুজন যখন নামছে। কিন্তু কত পাশাপাশি তা বোধ হয় সেকেণ্ড মাস্টারের নজরে পড়েনি। কথা বলার ধরন দেখেও সন্দেহ করেনি কিছু। ভাবিনীদি সঙ্গে নেই, উটকো একটা লোকের সঙ্গে বাড়ির বৌয়ের হেসে হেসে কি এত কথা। গায়ে ঢলে পড়ে কিসের আলাপ।

পুকুরঘাট থেকে পারুল চোখ ফিরিয়ে দেখল। দাওয়ার ওপর পুঁথিপত্তর খুলে সেকেণ্ড মাস্টার বসেছে। দেয়ালের ওপর বিরাট ছায়া, মানুষটার চেয়েও বড়। শুধু দেয়ালের ওপরই নয়, ওই ছায়া এসে পড়েছে পারুলের জীবনে। রাহুর ছায়ার মত ওর জীবনের সব কিছু গ্রাস করতে উন্মুখ।

থালাবাসনগুলো মাজবার সময় ইচ্ছা করেই পারুল চুড়ির ঝঙ্কার তুলল। অন্তত একটুখানির জন্যও মানুষটা দেখুক মুখ তুলে। মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করুক কিছু। কিন্তু সেকেণ্ড মাস্টার আরো ঝুঁকে পড়ল খাতাপত্রের দিকে। মোটা পেন্সিল দিয়ে আঁকি-বুকি কাটল।

সেকেণ্ড মাস্টার কথা বলল তার পরের দিন।

খেয়ে দেয়ে স্কুলে বেরোবার সময় পারুলের মুখোমুখি দাঁড়াল।

—চাবিটা দেখি!

কোমরে আঁচল জড়িয়ে পারুল নিচু হয়ে উনানের ছাই তুলছিল, সেকেণ্ড মাস্টারের কথায় সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—কিসের চাবি?

—দরজার।

—বাড়তি চাবি তো রয়েছে তোমার কাছে।

—হ্যাঁ রয়েছে, কিন্তু ওটাও দরকার।

কেন দরকার বুঝতে পারুলের একটুও দেরি হল না। মনে হল ওর হাতের ছাই সেকেণ্ড মাস্টার ওরই সারা মুখে মাখিয়ে দিল।

দাঁতে দাঁত চেপে পারুল বলল, ওই তাকের ওপর আছে, নিয়ে যেতে পার।

চাবি পাড়তে গিয়ে সিঁদুরের কৌটোটা ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর। রক্তের কণার মত লালচে ছিটে। কিছুটা দেয়ালে, কিছুটা মেঝের ওপর।

ছাইমাখা হাতেই পারুল উঠানে বসেছিল। খেয়াল হল দরজায় তালা লাগানর শব্দে। পুরোনো দরজার কবাট দুটো আর্তনাদ করে উঠল। দরজা নয়, ও যেন পারুলেরই অসহায় কাকুতি।

সেকেণ্ড মাস্টারের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই পারুল উঠে বন্ধ দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেনে খোলবার বৃথা চেষ্টা করে আবার বসে পড়ল দাওয়ার ওপর। কাল রাতে একটু ভয় ভয় করেছিল পারুলের। বাড়ির লোকের মেঘথমথম মুখ দেখে শঙ্কা হয়েছিল। কালবৈশাখীর মেঘের সম্ভার দেখে যেমন উদ্বিগ্ন হয় কুঁড়ে ঘরের বাসিন্দার মন। কিন্তু আজ আর একটুও ভয় করছে না। পারুল নয়, এবার ভয় পেয়েছে সেকেণ্ড মাস্টার। বাড়ির বৌকে আটক রাখলেই বুঝি তার মনকেও আটকানো চলে।

শুধু একদিন নয়, পর্ পর দিন তিনেক। অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেল পারুলের। সেকেণ্ড মাস্টার খাওয়া শেষ করে উঠলে সুপুরির কুচির সঙ্গে চাবিও এগিয়ে দেয়। দরজা বন্ধ করে যেতে যাতে ভুল না হয়।

সেদিন মেঝেয় আঁচল পেতে পারুল শুয়ে ছিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। আচমকা জানলায় টোকা পড়তে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। উঠে বসেই অপ্রস্তুত। ঠিক এই ভয়টাই এ কদিন ধরে করছিল। তারাচরণ যদি এসে দেখে দরজায় জাঁদরেল তালা, অথচ ভিতরে মানুষ নড়াচড়া করছে, তা হলে কি ভাববে! এমন একটা আজব বন্দোবস্তর কি কৈফিয়ৎই বা পারুল দেবে।

ঠিক জানলার ওপারে তারাচরণ। পরনে চকচকে সিল্কের সার্ট, পকেটে নীলচে রুমাল অপরাজিতার কুঁড়ির মতন উঁকি দিচ্ছে। এলোমেলো চুলে তেলের বালাই নেই। গালে পান, মুখে হাসি।

পারুল জানলার কাছ বরাবর যেতেই বলল, কি ব্যাপার, জানকী অশোককাননে বন্দিনী যে?

বিশ্রী একটা আবহাওয়া, তবু পারুল কথায় পরিহাসের ফিকে রং চড়াল, তাই বুঝি খোঁজ নিতে পবননন্দন স্বয়ং হাজির।

খোঁচ তারাচরণ গায়ে মাখল না, বলল, চালাকি নয়, কি ব্যাপার বল তো?

পারুল মুচকি হাসল, বিয়ে-করা পরিবার উটকো লোকের গায়ে গা লাগিয়ে বেড়াবে তা কোন্ স্বামীর সহ্য হয় বল? তোমারই যদি এমন হতো?

—তাই তালা লাগিয়ে বউকে নজরবন্দী?

—এ ছাড়া আর উপায় কি। ইস্কুল কামাই করে তো ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে পারে না, তা হলে মুখের অন্ন যে উঠে যাবে।

দাঁতে দাঁত চেপে তারাচরণ কি ভাবল। দু-এক মিনিট। তারপর বলল, সেদিন তোমার কর্তাকে আমি যেন দেখেছিলাম। 'চাঁদিনী' সিনেমার সামনে বাণী প্রেসের দরজায় বোধ হয় ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। আমি এক নজরে ঠিক বুঝতে পারি নি।

—তা হবে। সভার কাগজপত্র একগাদা তো ছাপিয়ে আসছে। কোন কৌতূহল নেই পারুলের। নির্লিপ্ত, নিস্তেজ কণ্ঠ।

—সভা আবার কিসের ?

—বোধ হয় পাপমোচন সমিতি কিংবা পাষণ্ডদলন সম্মেলন। ঘরের বৌকে সায়েস্তা করে তার সূচনা।

হালকা গলায় কথাগুলো বলল বটে পারুল, কিন্তু বুক-কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস লুকাতে পারল না। যতই লঘু করুক স্বর, অপমানের কাঁটা বিঁধে রয়েছে বুকের মাঝখানে। যন্ত্রণায় মুখের রং নীলচে।

—আচ্ছা মানুষ তো। বেরোবার কোন পথ নেই ?

—আছে, পারুল মুচকি হাসল, পুকুর সাঁতরে। কিন্তু কপালের গুণে, শহরের মেয়ে যে, জলে নামলেই তলিয়ে যাব। পারে আর পৌঁছোতে হবে না।

কথা বলতে বলতে পারুল থেমে গেল। একটি বর্ণও কানে যাচ্ছে না তারাচরণের। জুতো দিয়ে ধুলার ওপর আঁকিবুকি কাটতে কাটতে কি ভাবছে।

—কি ভাবছ ? কথা থামিয়ে পারুল জিজ্ঞাসা করল।

—ভাবছি, আমি যদি সেকেণ্ড মাস্টারের বৌ হতাম তো ঘরের মটকায় আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যেতাম।

—ওমা, জতুগৃহদাহ হত যে ! নিজেও যে পুড়ে মরতাম সেই সঙ্গে। বেশ মতলব তো দিচ্ছ।

বেশীক্ষণ তারাচরণ দাঁড়াল না। এদিক ওদিক করে সরে পড়ল। যাবার আগে জানলার গরাদে মাথা রেখে মনের কথা খুলে বলল। এ কদিন ছটফট করেছে। রাতে ঘুম নেই। কিছু ভাল লাগে না। মনটা কেবল পারুলের বাড়ির আনাচে কানাচে ঘোরে।

একটি কথারও পারুল উত্তর দিল না। দেয়ালে মাথা রেখে চুপ করে

শুনল। পুরুষের পক্ষে যা সহজ, মেয়ের বেলায় তা যে কি দুরূহ, তা কি বুঝবে তারাচরণ। এ কদিন পারুলের বুকের মধ্যেও যেন ঝড়ের দাপা-দাপি, কান্নার কুণ্ডলী গলার কাছে, বারবার ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠেছে। যে মধুর স্বপ্ন দেখেছে পারুল সারাটা কুমারী-জীবন ধরে, যে আশা বুকের রক্ত দিয়ে লালন করেছে, সে স্বপ্নেরই ছোঁয়াচ তারা-চরণের সেদিনের কথাগুলোর মধ্যে, সংসারের হাজার ধাক্কায় ভেঙে পড়া নির্জীব মনকে নতুন করে বাঁচার ইঙ্গিত।

—তুমি যাও লক্ষ্মীটি, কোথা দিয়ে আবার কে দেখে ফেলবে, আমার হেনস্তার অন্ত থাকবে না। খুব আস্তে, বিড়বিড় করে পারুল কথাগুলো বলল।

যাবার সময়ে তারাচরণ হাত বাড়িয়ে পারুলের আঙুলগুলো ছুঁয়ে দিল। হাসল আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে, তারপর এদিক ওদিক চেয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল।

দেয়ালে মাথা রেখে পারুল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একসময়ে গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ তেরচা হয়ে নামল। দুপুর গড়িয়ে বিকাল। লোকজনের চলাচল বাড়ল। পারুল আস্তে আস্তে সরে এসে ঘরের দাওয়ায় বসল পা ছড়িয়ে।

বেশিক্ষণ বসা চলবে না, এখনি চাবি খোলার শব্দ হবে। তালতলার চটির ফটফটানি। বগলে খাতাপত্র, ঘামজবজবে দেহ নিয়ে সেকেণ্ড মাস্টার ঘরে ঢুকবে। পারুলের ইহকালের দেবতা, হিন্দু শাস্ত্রমতে জন্মজন্মান্তরেরও।

দিন পাঁচেক, তারপর সেকেণ্ড মাস্টার থেমে গেল। চাবি হাতে নিয়ে ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে তাকের ওপর চাবিটা রেখে দিল।

পুকুরঘাট থেকে এসে পারুল অবাক হয়ে দাঁড়াল। বাইরের দরজা

অল্প ফাঁক। তালার বাধন নেই। এগিয়ে গিয়ে দরজায় হাত রাখতেই দরজা খুলে গেল। বাইরের ঝিরঝিরে হাওয়া। দরজার পাল্লায় হাত রেখে পারুল অনেকক্ষণ দাঁড়াল। সেকেণ্ড মাস্টার বুঝি ভুলে গেছে চাবি লাগাতে, না মতই বদলাল এতদিন পরে।

খাওয়াদাওয়ার পরে পারুলের একবার মনে হল অনেকদিন যাওয়া হয়নি ভাবিনীদির বাড়ি। গেলে হয় দুপুরবেলা। ঘুরপথে চাঁদিনী সিনেমার সামনে দিয়ে। বলা যায় না, দেখাও হয়ে যেতে পারে তারাচরণের সঙ্গে! মানুষজনের চোখ বাঁচিয়ে চোখের ইসারা, কান বাঁচিয়ে ফিসফাস কথাবার্তা। তারাচরণও অনেকদিন এ পথ মাড়ায় নি। ভালই করেছে। এলেও কি হত। তারাচরণ দাঁড়াত পথের ধুলোর ওপর, আর পারুল ঘরের খাঁচায়। পথচলতি লোকের আরো সন্দেহ বাড়ত। তার ওপর আচমকা সেকেণ্ড মাস্টার এসে পড়লেই কেলেঙ্কারি। তারাচরণের পালাবার পথ থাকত না।

সাতপাঁচ ভেবে পারুল আর বেরোল না। বলা যায় না, তালা দিতে ভুলে গেছে, কথাটা স্কুলে মনে পড়লেই সেকেণ্ড মাস্টার হয়তো সোজা বাড়ি চলে আসবে। এসে যদি দেখে পাখি এবারেও দাঁড়ে নেই, তা হলে ক্ষেপেই যাবে। নিজের হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়বে। কিংবা বলা যায় না, এও হয়তো সেকেণ্ড মাস্টারের একটা কায়দা। খাঁচার দরজা খুলে লুকিয়ে রয়েছে কাছে কাছে। পাখি পোষ মেনেছে কিনা তা দেখার অপেক্ষায়। এবার বেরোলে খাঁচার দরজাই শুধু চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে না, সেকেণ্ড মাস্টার নির্মমহাতে পালক ছেঁটে দেবে। ওড়ার সাধ জন্মের মতন শেষ।

পরের দিনও তাই। সেকেণ্ড মাস্টার তাকের দিকেও গেল না। হাতের খাতাপত্রগুলো গোছাতে গোছাতে বলল, দেখি দড়ি-টড়ি কিছু আছে?

গলার আওয়াজ অনেক মোলায়েম। পারুল বালতি হাতে উঠানের ওপর দাঁড়িয়েছিল। উদ্দেশ্য সেকেণ্ড মাস্টার বেরিয়ে গেলে দাওয়াটা মুছে ফেলবে। সেকেণ্ড মাস্টারের গলার স্বরে বালতি উঠানের মাঝখানে নামিয়ে রেখে সরে এসে দাঁড়াল।

—কিছু বললে ?

—বলছিলাম, খাতাগুলো বাঁধব, একটু দড়ি-টড়ি ?

পারুল ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখল। দেখতে দেখতেই মুচকি হেসে বলল, ও খাতা বাঁধবে, আমি ভাবলাম বুঝি আমাকেই বাঁধবে আষ্টেপৃষ্টে, মোক্ষম করে।

এ রসিকতার সেকেণ্ড মাস্টার কোন উত্তর দিল না। উত্তর দেবার সময়ও নেই। রোদ সরে সরে এসেছে কুলগাছতলায়। তার মানে প্রায় সাড়ে নটা। এতটা পথ পাড়ি দিতে বেশ দেরি হয়ে যাবে। ঘণ্টা বাজার পর গেলেই, হেডমাস্টারের শেয়াল-সতর্ক চোখ এড়িয়ে যেতে হবে, ঝাঁঝাঁল শ্লেষোক্তি।

দড়ি পারুল পেল না, কিন্তু আর এক কাজ করল। নিজের চুলের ফিতা এনে দিল। নতুন ফিতা। তেলের দাগ লাগবার ভয় নেই খাতার ওপর। একটু তেলের গন্ধ থাকলেই বুঝি ভাল হতো। সেকেণ্ড মাস্টার থ্যাবড়া নাক দিয়ে সারাটা পথ ঘ্রাণ নিত।

হাত বাড়িয়ে সেকেণ্ড মাস্টার ফিতাটা নিল বটে, কিন্তু খাতা বাঁধল না। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে চালের বাতায় গোঁজা ছেঁড়া গেঞ্জীর টুকরো নিয়ে চটপট বেঁধে ফেলল খাতার বাণ্ডিল। ফিতাটা দাওয়ার ওপর ফেলে খোলা দরজা দিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল।

ফিতাটা দাওয়া থেকে পারুল কুড়িয়ে রাখল। রসকস নেই মানুষটার, রুচিবোধের বালাই নয়। ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জির টুকরো দিয়ে খাতা বাঁধবে তবু চুলের ফিতা ছোঁবে না। পোশাকেরই

বা কি ছিরি। নিজের হাতে ক্ষার দেওয়া ফতুয়া, আধময়লা, সহস্রছিন্ন ধুতি, পায়ের চটি আঙুলের আব্রু রাখতে অপারগ। গোটা দুয়েক আঙুল সব সময়েই বাইরে। এমন মানুষকে আবার ভাল জিনিস কেউ দেয় এগিয়ে!

মেঝেটা গামছা দিয়ে মুছে পারুল সবে ঘুমোবার আয়োজন করছে এমন সময় দরজায় শেকলের শব্দ।

সর্বনাশ, দরজা খোলা পেয়ে তারাচরণই বুঝি চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। ঘরে ঢোকবার আগেই বলে দেওয়া দরকার। কোনদিন সেকেণ্ড মাস্টারের চোখে পড়ে যাবে, কেলেঙ্কারির একশেষ। কিংবা সেকেণ্ড মাস্টারও হতে পারে। বলা যায় না, স্কুল পালিয়ে বৌয়ের খোঁজ নিতে এসেছে।

খিল খুলেই পারুল পিছিয়ে এল। দুজনের কেউ নয়। ছোকরা গোছের একজন। কারুর বাড়ির ঠাকুর-চাকরই বুঝি হবে।

—কাকে চাই?

—আজ্ঞে আপনাকে। এটা মাস্টার মশাইয়ের ঘর তো?

—হ্যাঁ।

—তারাচরণবাবু পাঠিয়ে দিলেন। চাঁদিনী সিনেমার তারাচরণবাবু!

কথার ফাঁকে ফাঁকে লোকটা বারদুয়েক ঢোঁক গিলল তারপর এদিক ওদিক চেয়ে কোমরের কষি থেকে কাগজের টুকরো বের করল।

—একটা চিঠি দিয়েছেন।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিতে নিতেই পারুল জিজ্ঞাসা করল, কিসের চিঠি?

কিসের চিঠি ছোকরাটার অবশ্য জানবার কথা নয়, তাই সে

ফিসফিসিয়ে বলল, আজ্ঞে তা তো জানি না। বাবুর খুব জ্বর। বললেন চিঠিটা মাস্টার মশায়ের পরিবারের হাতে দিয়ে আসতে। চুপি, চুপি। কেউ দেখতে না পায়।

কথার মাঝখানেই পারুল ধমক দিয়ে উঠল, আচ্ছা, ঠিক আছে, যাও তুমি।

দরজা বন্ধ করে পারুল দাওয়ায় এসে বসল।

নামেই চিঠি। লাইন তিনেক। অাঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা। খুব জ্বর তারাচরণের। আজ দিন চারেক। মাথা তুলতে পারছে না। দেখাশোনা করার কেউ নেই। সম্বলের মধ্যে সিনেমার এক ছোকরা চাকর। ওষুধ থেকে পথ্য সবই তার দয়ায়। একবার আসবে পারুল? অল্পক্ষণের জন্য।

ছোট্ট চিঠি কিন্তু পারুল অনেকবার পড়ল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। চিঠির শেষে একটা কথা তারাচরণ লিখেছে। ইতি তোমারই তারাচরণ। তারাচরণ যে ওরই এ কথা সেদিন সিনেমায়ও শুনিয়েছে। আর তার কেউ কোথাও নেই। পারুলের হাতে ছেড়ে দিতে চায় নিজেকে। কথাটা মনে পড়তে পারুল মুখ টিপে হাসল। ছেড়ে তো দেবে কিন্তু হাত খালি কোথায় পারুলের। জলজ্যান্ত একটা সেকেণ্ড মাস্টারের ভার তার ওপর। তার দেখাশোনা, সুখশান্তি সব কিছুর দায়িত্ব।

পারুল উঠে দাঁড়াল। দরজা অবধি এগিয়ে গেল, আবার কি ভেবে ফিরে এসে বসল দাওয়ায়। ঠিক চাঁদিনী সিনেমার পিছনেই তারাচরণের ঘর। একতলা পাকা বাড়ি। তারই নিচের তলার বাসিন্দা। এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। কিন্তু সব সময়ে পথের দূরত্বের পরিমাপ কি ওভাবে করা চলে।

পারুল একবার ভাবল। ক্ষতি কি। দরজায় তালা লাগিয়ে তারাচরণকে

যদি একবার দেখে আসে। এর মধ্যে যদি সেকেণ্ড মাস্টার এসেই পড়ে কিছু একটা মনগড়া কৈফিয়ত দিলেই হবে। ভাবিনীদির শরীর খারাপ। লোক দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল। বাতের ব্যথাটা আবার বেড়েছে। নড়াচড়া করার শক্তি নেই। কাছে বসে থাকা, সুখদুঃখের কথা দু একটা, তাতেই দেরি হয়ে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ভেবে পারুল আর গেল না। কোথা দিয়ে কে দেখে ফেলবে। চোখ তুলে সেকেণ্ড মাস্টারের দিকে আর চাইবার জো থাকবে না।

গেল না বটে পারুল, কিন্তু সারাটা দুপুর ছটফট করল। চোখের পাতা বুজলেই মানুষটার চেহারা। জ্বরতপ্ত মুখ, উস্কোখুস্কো চুলের রাশ, লাল দুটি চোখ। সে চোখে বেদনার পাশাপাশি সেবা পাবার প্রার্থনা। ঠক করে একটা শব্দ হতেই পারুল উঠে পড়ল। আবার কে এল। তারাচরণ অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে আবার বুঝি পাঠাল কাউকে। এবার পারুলকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

উঠেই পারুলের ভুল ভাঙল। কাক বসেছে গাছের মগডালে। কি একটা ফেলল উঠানের ওপর। তারই শব্দ, মানুষজন কেউ নয়।

কথাটা মনে হতেই পারুলের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। ভুল হয়ে গেছে। নাই যদি যেতে পারল পারুল, চিঠির উত্তরও তো একটা দিতে পারত। তিন লাইনের বদলে আরো তিন লাইন। নিজের অবস্থা বুঝিয়ে ক্ষমা চেয়ে। সব শেষে না হয় তারাচরণের মতনই গোটা গোটা অক্ষরে লিখত, ইতি তোমারই পারুল। জ্বরক্লান্ত দুর্বল মানুষটা তবু কিছুটা সান্ত্বনা পেত। কিন্তু নিজের মনেই পারুল মাথা নাড়ল। মুখে বলছে বটে, কিন্তু লিখতে পারুলের ভারি লজ্জা করত, ছি, ছি, কি মনে করবে তারাচরণ। তারাচরণেরই যদি পারুল তো অন্য মানুষের সাজানো সংসারে বসে রয়েছে কেন। নিজের জীবন আর-

একজনের জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধেছে কেন এমন-ভাবে !

বরাত পারুলের। পরের দিনই সুযোগ জুটে গেল। সেকেণ্ড মাস্টার বাইরে বেরোবার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। পারুল রান্নাঘরে ছিল, সেকেণ্ড মাস্টার সেদিকে চেয়ে গলার আওয়াজ চড়াল।

—শুনছ, ফিরতে আজ রাত হবে। পঞ্চাননের ভাইয়ের বিয়ে। বিয়ের খাওয়াদাওয়া সেরে আসব। সেকেণ্ড মাস্টার চৌকাঠ পার হয়ে যেতে পারুলের খেয়াল হল। পঞ্চানন, কোন পঞ্চানন! বোধ হয় স্কুলের কোন মাস্টারই হবে, ছাত্র হওয়াও বিচিত্র নয়। পঞ্চানন যেই হোক তাতে পারুলের কিছু আসে যায় না, সেকেণ্ড মাস্টার অনেক রাত অবধি বাইরে থাকবে, পারুলের এইটুকুই লাভ। চোরের রাত্রিবাসের মতন।

ঝাঁটপাট রান্নাঘরের কাজ সারতে পারুলের মিনিট পনেরো। তারপর সাবানের টুকরো নিয়ে পুকুরঘাটে বসল। মুখ, ঘাড়, দুটো গাল রগড়ে রগড়ে লাল করে তুলল। আয়নার সামনে বসে চুল বাঁধা টিপ পরা সারতেও বেশ কিছুক্ষণ। কাপড় বাছাই করতে গিয়েই বিপদে পড়ল। ভালো শাড়ি তো গোটা কয়েক, তাও অনেকগুলোর পাড় জ্বলে গেছে, আর একটা ফেঁসে গেছে জায়গায় জায়গায়। বাকি যেটা, সেটা দেখে দেখে তারাচরণের চোখ বোধ হয় পচে গেছে। উপায় !

উপায় একটু পরেই মনে হল। রোগীর ঘরে সাধারণ সাদা শাড়ি পরেই তো যাওয়া উচিত। লাল পাড় আটপৌরে।

লালপাড় নেই, খয়েরী আছে। সাদা জমি। সেটাই পারুল জড়িয়ে নিল। দরজাটা টেনে বন্ধ করে তালা এঁটে দিল। পথে পা দেবার আগে চোখ ঘুরিয়ে দেখল এদিক ওদিক। বলা যায় না, সেকেণ্ড মাস্টার

কাছে পিঠে কোথাও ওৎ পেতে নেই তো। বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে। টুঁটি টিপে ধরবে একেবারে।

'চাঁদিনী' সিনেমার কাছে বরাবর এসে থামল। জন কয়েক লোক চলাফেরা করছে। দু-একজন জটলা করছে বুকিং অফিসের সামনে। কি একটা হিন্দী বই। পড়তে পারল না পারুল, কিন্তু ছবিটা চেয়ে চেয়ে দেখল। আলিঙ্গনাবদ্ধ তরুণ-তরুণী। এধারে ওধারে ময়ূর ঘুরছে, দু-একটা হরিণের ছানাও। প্রেম করার উপযুক্ত জায়গা। সিনেমাওয়ালাদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তা নয়. কুসুমপুর আবার একটা জায়গা। মজা ডোবা আর পচা পানা বোঝাই। নিরিবিলি জায়গা পাওয়াই মুশকিল। কৌতূহল-চকচক চোখের সার।

বাড়িটার সামনে এসে পারুল দম নিল। আগে তারাচরণই একবার বাড়িটা দেখিয়েছিল। ভাবিনীদিও ছিল সঙ্গে। একতলার এ পাশের দরজা। তারাচরণ একলাই থাকে। দেখাশোনা করে ঐ 'চাঁদিনী' সিনেমারই এক ছোকরা চাকর। একাধারে সঙ্গী আর সচিব। চাকর আর পাচকের মিশেল।

দরজা ঠেলতে হল না। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখা গেল।

ছোট তক্তপোশ, এপাশে কেরাসিন কাঠের টেবিল, একটা টুল। কোণের দিকে রঙ-চঙে একটা ট্রাঙ্ক। জিনিসপত্র রয়েছে কিন্তু মানুষটা কোথায়। জ্বরটর সব বুঝি বাজে কথা, পারুলকে কাছে নিয়ে আসার ছুতো। আচ্ছা লোক তো।

একটু দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখা গেল। বোধ হয় ভিতরে কোথাও গিয়েছিল, আস্তে আস্তে দেয়ালের কপাট ধরে এসে দাঁড়াল।

এ কদিনেই বেশ কাহিল। শুকনো মুখচোখের চেহারা। উস্কো চুলের রাশ। পরনে গেঞ্জি আর ময়ূরপঙ্খী লুঙি।

ছল নয়, সত্যিই ভুগেছে মানুষটা। এখনো হয়তো ভুগছে, কে জানে! পারুলের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ভিজে-ভিজে চোখের পাতা। থরথর-করে-কেঁপে-ওঠা ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরল।

—বেশ লোক যা হোক, দরজায় অতিথি দাঁড়িয়ে, হুঁশই নেই।

জানলার গরাদ ধরে পারুল কথাগুলো বলল।

চমকে উঠল তারাচরণ। জানলার দিকে চেয়েই বিস্ময়ে ফেটে পড়ল।

—একি, তুমি?

—আর কাউকে আশা করেছিলে নাকি?

—আমার আর কে আছে। দরজা খুলতে খুলতে তারাচরণ সনিশ্বাসে বলল।

পারুল চৌকাঠ পার হয়ে ঘরে পা দিতেই তারাচরণ দুটো হাত দিয়ে তার একটা হাত আঁকড়ে ধরল।

—কাল খুব আশা করেছিলাম, তুমি আসবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি তোমার জন্য।

হাতে হাত ঠেকতেই পারুল চমকে উঠল।

ইস্, গা যে পুড়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে তুমি ঘোরাফেরা করছ। শুয়ে পড় বিছানায়।

আর একটি কথাও নয়। শান্তশিষ্ট ছেলের মতন তারাচরণ গুটি গুটি পা ফেলে বিছানায় গিয়ে শুল। পায়ের কাছে জড় করে রাখা গায়ের কাপড় বুক অবধি টেনে দিল।

পারুল মাথার কাছে বসল। একটা হাত দিয়ে চুল টেনে দিতে দিতে বলল, আমার বুঝি আর ঘরসংসার নেই। যখন তখন বাইরের লোকের হাতছানিতে আসা যায়। এত অবুঝ কেন তুমি?

হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে, এইভাবে তারাচরণ বলল, তোমার চাবি দেওয়ার পালা বন্ধ হয়েছে, না, আজও সেকেণ্ড মাস্টার ঘরে আটকে রেখে স্কুল যাচ্ছেন?

—আটকানো থাকলে আর আজ এলাম কি করে তোমার কাছে?

তারাচরণ আর কথা বাড়াল না। চুপচাপ শুয়ে রইল চোখ বন্ধ করে। এক সময় নিজের একটা হাত বাড়িয়ে পারুলের হাত চেপে ধরল।

—ডাক্তার দেখাচ্ছ তো?

থমথমে গলার আওয়াজ পারুলের। ভাবনা ওর কম? সেকেণ্ড মাস্টারের হঠাৎ ফিরে আসার ব্যাপার রয়েছে, তাছাড়া খোলা জানলার সামনে পরপুরুষের সান্নিধ্য। কোথা দিয়ে কেউ দেখে ফেললেই সর্বনাশ। কুৎসার চোটে সেকেণ্ড মাস্টারকে হয়তো ঠাঁই বদলই করতে হবে। এ গাঁয়ে বাস উঠিয়ে, তল্পিতল্পা বেঁধে অন্য কোথাও ঘর বাঁধা। কিংবা বলা যায় না, তেমন তেমন হলে সেকেণ্ড মাস্টার পারুলকেই বর্জন করবে। আদর্শনিষ্ঠ মাস্টার অসতী স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়াবে, তা কখনও হতে পারে। একেবারে পুরাণের রামের সগোত্র। প্রজানুরঞ্জন আর সমাজরঞ্জন একই কথা। অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করলেও ঘরে ফিরে আসা চলবে না পারুলের।

আশ্চর্য, পারুলের মনের কথাটাই কেমন করে তারাচরণ বুঝি জানতে পারল। ডাক্তার দেখানোর কথা বাদ দিয়ে এই কথাই বলল।

—চল আমরা চলে যাই কোথাও। মানুষজনের ভয়ে এমন করে চোরের মতন লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করতে আর ভাল লাগে না।

উত্তরে পারুল মাথাটা আরো নিচু করল। তারাচরণের জ্বরের তাপ পারুলের দুটি গালে। পায়ে শক্ত করে শিকল বাঁধা পাখিকে আবার আকাশের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। যা হবার নয়, সে সব কথা ভেবে লাভ!

অনেকক্ষণ পরে পারুল কথা বলল। বুকের দাপাদাপি অনেকটা সামলে নিয়ে। কোথায় যাব?

—তোমার সেকেণ্ড মাস্টারের নাগালের বাইরে।

সেকেণ্ড মাস্টারের নাগাল! তারাচরণের কি ধারণা যতটুকু সেকেণ্ড মাস্টারের বেত পৌছোয়, ততটুকু এলাকাতেই সেকেণ্ড মাস্টারের জোর। সাতপাকের বাঁধন, আগুন সাক্ষী, মন্ত্র সাক্ষী, পৃথিবীর যে কোন কোণ থেকে পারুলকে টেনে হিঁচড়ে আনতে পারে সেকেণ্ড মাস্টার, শুধু এই সবের জোরে। আইন সহায়, পালিয়ে বুঝি নিস্তার পাবে পারুল।

কিন্তু এত কথা তারাচরণকে বলে লাভ নেই। জ্বরে ধুঁকছে। নিশ্বাসে আগুনের হলকা। কথাবার্তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। একটুতেই উত্তেজিত হয়ে উঠবে।

—ওসব কথা এখন থাক। তুমি চোখ বুজিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর।

—বারে, তারাচরণ হাসল, এত সাধ্য-সাধনা করে তোমায় ডেকে আনলাম, ঘুমোব বলে বুঝি।

লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়ো না। চুপচাপ শুয়ে থাক। আমি তো বসে রয়েছি তোমার পাশে।

কি জানি কি বুঝল তারাচরণ। আর কথা বাড়াল না। পারুলের হাতটা নিজের শক্ত মুঠোয় ধরে চোখ বুজল। আস্তে আস্তে এক সময় মুঠি শ্লথ হয়ে এল। এলিয়ে পড়ল মাথাটা বালিশের এপাশে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তারাচরণ।

পারুল উঠে এদিকের জানলাটা বন্ধ করে দিল। রোদটা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। কেরাসিন কাঠের টেবিলের ওপর গোটা দুয়েক ওষুধের শিশি। পাশে আধখাওয়া একটা কমলালেবু। একটা নীল মাছি ঘুরছে তার ওপর। নিচে রাখা কুঁজোটার গা বেয়ে জলের ধারা মেঝেয় গড়িয়ে পড়ছে।

উঃ। তারাচরণ অস্ফুট গলায় শব্দ করল।

পারুল বিছানার কাছে সরে এসে হাত রাখল তারাচরণের কপালে। জ্বরটা বাড়ছে। বোধ হয় মাথায় যন্ত্রণাও রয়েছে। মাঝে মাঝে তারাচরণ ভ্রু কোঁচকাচ্ছে।

এদিক ওদিক চেয়ে কুঁজোর মুখে জড়ান ন্যাকড়ার ফালি পারুল খুলে নিল। কুঁজো থেকে জল গড়াল গ্লাসে। তারপর তারাচরণের মাথার কাছে উঠে বসে তার কপালে জলের পটি দিতে লাগল।

প্রথমে ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠল! মাথাটা নাড়ল দুচারবার। কষ্টে তারাচরণ চোখের পাতা খুলল।

—পারুল!

পারুল ঝুঁকে পড়ল তারাচরণের দিকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, এই যে আমি তোমার কাছেই রয়েছি। কি বলবে বল?

হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে তারাচরণ পারুলকে খুঁজল। আবার ডাকল, পারুল, কই তুমি?

পারুল উঠে তারাচরণের এ পাশে এসে বসল। একটা হাত রাখল তার গায়ের ওপর, এই যে আমি, কিছু বলবে?

মুখে কিছু বলল না তারাচরণ। দুটো হাত দিয়ে পারুলকে আঁকড়ে ধরল। টেনে নিয়ে এল নিজের বুকের ওপর, তুমি ছেড়ে যেও না আমাকে। বল ছেড়ে যাবে না, বল, বল?

কথার সঙ্গে সঙ্গে পারুলকে চেপে ধরল বুকের মাঝখানে।

চেষ্টা করেও পারুল নিজেকে ছাড়াতে পারল না। গায়ে মাথার কাপড় সরে গিয়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসবে, এমনি ভাব। অদ্ভুত এক অনুভূতি। বাধা দেবার শক্তিও পারুলের স্তিমিত হয়ে এল। তারাচরণের বুকের ওপর মাথাটা রেখে পড়ে রইল চুপচাপ।

হঠাৎ দরজায় শব্দ। আঙুলের টোকা। ধড়মড়িয়ে পারুল উঠে বসল। বেশবাস ঠিক করে তক্তপোশ থেকে সরে আসবার আগেই চোখোচোখি হয়ে গেল।

ভিতরের দিকে দরজার এপাশে কালকের চিঠি-নিয়ে-যাওয়া ছোকরাটি দাঁড়িয়ে। দুচোখে চাপা কৌতুকের ঝিলিক। বোধ হয় ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়েছিল, কাণ্ডকারখানা দেখে আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দরজায় টোকা দিয়ে ঘরের মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছে।

দু এক মিনিট। তার মধ্যেই পারুল নিজেকে সামলে নিল। দাঁড়িয়ে উঠে বলল, এঁর দেখাশোনা কি তুমিই করছ?

ছোকরাটি দুটো হাত নিজের বুকের ওপর জড়ো করে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ মা, ওষুধপত্র আনা, ঘরদোর ঝাড়ামোছা, রান্নাবান্না সবই আমি করি।

—কোন্ ডাক্তার দেখছেন?

—পল্লী ফার্মেসির প্রবোধ ডাক্তার।

—কি অসুখ, শুনেছ কিছু?

—আজ্ঞে ডাক্তারবাবু বললেন, ডেঙ্গু। সারতে দিন সাতেক সময় নেবে।

এতক্ষণ ছোকরাটি শুধু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। কথার বদলে কথা। এবার কিছুটা সাহস পেয়ে বলল, একেবারে সময় পাই না মা। সিনেমায় সোডা লেমনেড বিক্রি করি। তার মধ্যেই সময় করে বাবুকে দেখে যাই। এক ফাঁকে রান্নাবান্না সেরে ফেলি। ছুটকো ফাইফরমাস খাটি।

—তোমার বাবুর জ্বর বেশ বেড়েছে। একবার ডাক্তারকে খবর দিতে পারলে ভাল হত।

—কিন্তু ডাক্তারবাবু তো পাঁচটার আগে বসেন না।

—ও, তাহলে সেই সময়ই বরং একবার খবর দিও তাঁকে।

আরো দু-একটা কথা বলতে গিয়েই পারুল থেমে গেল। খোলা দরজা দিয়ে উঠানের কিছুটা নজরে এল। রোদের তেজ ম্লান। বেলা গড়িয়ে আসছে।

কথাটা মনে হতেই পারুল আর দাঁড়াল না। তারাচরণের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখল। জ্বরে বেহুঁশ। সাড়া নেই। কিন্তু আর অপেক্ষা করার উপায় নেই। তেতে পুড়ে সেকেণ্ড মাস্টার ফিরবে। বৌকে বাড়িতে দেখতে না পেলে রাগে হয়তো মাথার চুলই ছিঁড়বে। পৈতা ছেঁড়াও বিচিত্র নয়। মানে মানে ঘরমুখো রওনা হওয়াই ভাল। নয়তো অদৃষ্টে কি আছে, বলা যায়।

চৌকাঠ বরাবর যেতেই আওয়াজ কানে এল।

—চলে যাচ্ছেন, মা ?

—হ্যাঁ আমার ঘর-সংসার রয়েছে তো।

—মা, গলায় অনুনয়ের সুর, রোজ দুপুরে একবার আসবেন।

—রোজ দুপুরে, পারুল ফিরে দাঁড়াল, ঘরসংসার ফেলে রোজ দুপুরবেলা তোমার বাবুর সেবা করতে আসা কি সম্ভব। তুমি বরং রোজ একবার করে বাবু কেমন থাকেন, সে খবরটা আমায় দিতে পারবে ?

দুটো হাত ছোকরাটির জোড় করাই ছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হেলাল মাথাটা।

পারুল আর দাঁড়াল না। জোর পায়ে একেবারে রাস্তায় এসে উঠল। চলতে চলতেই 'চাঁদিনী' সিনেমার সামনাসামনি এসে বাণী প্রেসের দিকে একবার চোখ ফেরাল। ভিতরটা অন্ধকার। কিছু দেখা গেল না। বলা যায় না, ইস্তাহার বগলে সেকেণ্ড মাস্টার হয়তো ঘাপটি

মেরে বসে আছে ওখানে। কুতকুতে চোখ দিয়ে সব দেখছে। হেডমাস্টারের চেঁচামেচি নয়, জোরগলায় অভিযোগ নয়, আবার বাড়তি চাবির খোঁজ পড়বে। শিকল পড়বে দরজায়। হয়তো ডবল তালার ব্যবস্থা।

বাড়িতে পা দিয়ে পারুল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। না, সেকেণ্ড মাস্টার ফেরে নি। যেখানকার জিনিস সেখানেই মজুত। মুখহাত ধুয়ে পারুল রান্নাঘরে ঢুকল। বিকালের জলখাবারের বালাই নেই। সেকেণ্ড মাস্টার দরকার হলে রাস্তা থেকেই মুড়ি কিনে আনে। মেজাজ ভাল থাকলে গুড়ের বাতাসা। আহ্নিক সেরে তাই মুখে দেয়। অবশ্য তালকানা নয় সেকেণ্ড মাস্টার। পারুলের জন্য আলাদা ঠোঙা। চায়ের সঙ্গে দু-এক মুঠো। চা সেকেণ্ড মাস্টার ছোঁয় না। কবে কারা হুজুগ তুলেছিল, চা বুঝি কুলির রক্ত। ব্যস, তাই বুঝে বসে আছে সেকেণ্ড মাস্টার! পারুলের হাজার উপরোধে কাপ ছোঁয় নি।

সেকেণ্ড মাস্টার যখন বাড়ি ফিরল, তখন পারুলের সন্ধ্যা দেওয়া শেষ। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে সবে গলা থেকে আঁচল খুলছে, দু বগলে খাতার বাণ্ডিল নিয়ে সেকেণ্ড মাস্টার থপাস করে দাওয়ার ওপর বসল।

—এত খাতা কিসের? পারুল উঠানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করল।

—ছেলেদের পরীক্ষা শেষ হল। ফতুয়া খুলতে খুলতে সেকেণ্ড মাস্টার উত্তর দিল।

যেখানে বাঘের ভয়, সন্ধ্যাও ঠিক ঘনিয়ে আসে সেখানে। পারুল সব জেনেও তবু লোভ সামলাতে পারল না। মুখ ফুটে বলে ফেলল, স্কুলের ছুটি হয়ে গেল বুঝি?

—হ্যাঁ, দু মাস। চালের বাতা থেকে হাত পাখাটা টেনে নিতে নিতে সেকেণ্ড মাস্টার বলল।

—দ সঙ্গে পারুলের চোখের সামনে নেমে এল কালো যবনিকা।
এ দাওয়া, কোণে রাখা তৈজসপত্র, খাতার বাণ্ডিল এমন কি সেকেণ্ড মাস্টারের বিরাট কাঠামোও অস্পষ্ট। তার মানে সারাটা দিন বাড়িতে বসে বসে সেকেণ্ড মাস্টার খাতা দেখবে। ভোর থেকে সন্ধ্যা। দরজার গোড়ায় এক পাল ছেলের ভিড়। নম্বর জানবার ব্যাকুলতা। পাশ না ফেল, সেটুকু শুধু শুনতে পেলেই খুশি। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ সেকেণ্ড মাস্টার একটু এদিক ওদিক নয়। যথাসময়ে সবই জানতে পারবে। আগে কিছু বলার নিয়ম নেই। সেকেণ্ড মাস্টারকে ছেড়ে তারা সেকেণ্ড মাস্টারের বৌকে এসে ধরবে। চুপি চুপি খাতাটা একবার দেখা। নম্বরের অঙ্কটা জানলেই তারা সরে যাবে একে একে।

কিন্তু তাহলে পারুলের কি হবে। তক্তপোশের ওপর একটা লোক জ্বরক্লান্ত দেহ নিয়ে ছটফট করবে, মুখে দু ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিতে ওই তো সিনেমার চাকরটি সম্বল। কাছে গিয়ে সেবা করা চুলোয় যাক, লোক মারফত খবর পাবারও কোন উপায় নেই। বাড়ির মানুষটা ঘাঁটি আগলে বসে থাকলে, কার সাধ্য চৌকাঠ ডিঙোয়!

রান্নার কাজ করতে করতেই পারুল মনে মনে ঠিক করে নিল। ছলছুতো করে বেরিয়ে পড়তে হবে ভাবিনীদির বাড়ি যাবার নাম করে। সেকেণ্ড মাস্টারের বৌ হয়েছে বলে পাড়া-পড়শীর আপদে বিপদে দেখাশোনাও করতে পারবে না। এ কেমন কথা। পাঁচজনের দায়-বিপদে গিয়ে দাঁড়ালে তবে তো তারা এসে তোমার পাশে দাঁড়াবে। এ সহজ সত্যটা কিছুতেই ঢোকে না সেকেণ্ড মাস্টারের মাথায়।

পরের দিন তাড়াহুড়ো করে খাওয়া দাওয়া সেরে নিল পারুল। আঁচলে মুখ মুছে পান গালে দিয়ে সেকেণ্ড মাস্টারের কাছে গিয়ে

দাঁড়াতেই বিপদ। সারা দাওয়ায় খাতাপত্র ছড়িয়ে সেকেণ্ড মাস্টারের নাজেহাল অবস্থা। দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছে খাতার পাতা। কুঁড়িয়ে কুড়িয়ে সেকেণ্ড মাস্টার ভাঙা আধভাঙা ইটের টুকরো জোগাড় করে চাপিয়েছে খাতার ওপর। উপুড় হয়ে একমনে দেখে যাচ্ছে তদ্ধিত আর শব্দরূপের খেলা, সন্ধিসমাসের অপূর্ব কসরত, ভুলের কাঁটাঝোপে বোঝাই রচনার রকমফের।

চুড়ির আওয়াজে মুখ তুলল। একবার আড়চোখে দেখল পারুলের আপাদমস্তক। নস্যির কৌটোটা খুলতে খুলতে বলল, খাওয়া হয়ে গেছে ?

পারুল ঘাড় নাড়ল। সেকেণ্ড মাস্টারের মেজাজ নরম। গলায় সহানুভূতির রেশ। এইবেলা বাইরে যাবার আবেদন পেশ করাই সমীচীন।

কিন্তু পারুল মুখ খোলবার আগেই সেকেণ্ড মাস্টার মুখ খুলল।

—ওই খাতাগুলো সরিয়ে, ওখানে বস, কাজ আছে।

কাজ! সর্বনাশ। ছাত্রদের ছুটি, তাই বুঝি সেকেণ্ড মাস্টার পারুলকেই পড়াতে শুরু করবে অভ্যাস ঠিক রাখার জন্য। নামতা পড়তে হবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, ধাতুরূপ আর শক্ত শক্ত বানান। বলা যায় না একটু ভুল করলেই হয়তো হাতপাখার বাঁট নেমে আসবে পিঠের ওপর। ভুলের শাস্তি হিসাবে রক্তাক্ত আঁচড় সারা পিঠে।

—ওদিকের খাতাগুলোয় নম্বর দেওয়া হয়ে গেছে। তুমি আলাদা কাগজে যোগ করে দেখো, ঠিক আছে কিনা।

শুধু মুখেই নয়, সেকেণ্ড মাস্টার হাতে-কলমে দেখিয়েও দিল। খাতার পাতা উল্টে উল্টে প্রথমে নম্বরগুলো লিখে নিতে হবে, তারপর যোগ। ব্যস, আর কিছু নয়।

পারুল অসহায় চোখ তুলে এধার ওধার চাইল। খাতা বড় কম নয়। যোগ দিতে দিতে দিন কাবার। চৌকাঠের বাইরে পা দেবার

উপায় থাকবে না। তাছাড়া, ভুলচুক যদি হয়ে যায়, সর্বনাশ। আঙুলের কড় গুণে গুণে সংখ্যা লেখার সময় একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই ক্ষেপে উঠবে সেকেণ্ড মাস্টার। কাজে সাহায্য তো নয়, কাজ বাড়ানো।

কথাটা গোড়াতেই বলে নেওয়া ভাল। আমি কি পারব? যদি ভুলটুল হয়ে যায়?

—ভুল মানুষেরই তো হয়, আবার শুধরে নেওয়াও যায়, অবশ্য যদি শুধরে নেবার মন থাকে।

পারুলের মনে হল ঠিক বুকের মাঝখানে কেউটের ছোবল। স্নায়ু শিরা অবসন্ন। রক্তের মধ্যে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুখের রং নীলচে, পা দুটো অসম্ভব কাঁপছে।

খুঁটিতে ভর দিয়ে পারুল দাওয়ার ওপর বসে পড়ল। চোখ তুলে দেখল সেকেণ্ড মাস্টারের দিকে। না, মানুষটাকে দেখে কিন্তু বোঝবার উপায় নেই। মাথা নিচু করে একমনে খাতা দেখে চলেছে। মোটা লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিচ্ছে লাইনে লাইনে, মার্জিনে মন্তব্য লিখছে।

এমন একটা কথা একটু আগে সেকেণ্ড মাস্টারের মুখ থেকে বেরিয়েছে, কিছুতেই তা মনে হল না।

নম্বর যোগ করতে গিয়ে আরো বিপত্তি। লাল পেন্সিলে লেখা অঙ্কগুলো যেন সেকেণ্ড মাস্টারের রক্তচক্ষু। মার্জিনে লেখা মন্তব্য যেন উদ্ধত তর্জনী। কিন্তু সব বাধা ঠেলে আর একটি কাতর মুখের ছবি ভেসে আসে। আত্মীয়স্বজনহীন প্রকোষ্ঠে একজনের উত্তপ্ত নিশ্বাসের ছন্দ। খুব আশা করবে উষ্ণ ললাটে কালকের মতন আলতো স্পর্শ। সেবা আর যত্ন।

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। সেকেণ্ড মাস্টার ভ্রূ কুঁচকে খাতা

থেকে মুখ তুলে চাইল। গম্ভীর গলায় বলল, কই শুরু কর। দিন সাতেকের মধ্যে আমায় সব খাতা শেষ করতে হবে।

দু হাঁটুর ওপর মুখ রেখে পারুল সামনে রাখা খাতার গোছা টেনে নিল। প্রথমেই দয়া সম্বন্ধে দীর্ঘ রচনা। লেখাটা বোধ হয় সেকেণ্ড মাস্টারের মনে ধরে নি। কেটে কুটে খণ্ড খণ্ড করেছে।

লাল পেন্সিলের হাতিয়ার চালিয়েছে নির্মমভাবে। তিন পাতা লেখাটার ওপর মাত্র দশ নম্বর। সেকেণ্ড মাস্টারেরই উপযুক্ত। যার নিজের মায়াদয়ার বালাই নেই, সহানুভূতি করুণার ছিটে ফোঁটা নয়, তার তো এসব ভাল লাগার কথা নয়।

মুখ বুজে পারুল নম্বর মিলিয়ে গেল। হিসাবে বার বার ভুল। শুধু যোগেই নয়, আলাদা কাগজে নম্বর ওঠাতেই গোলমাল। হাতটা থরথর করে কাঁপছে, জোর করে পেন্সিল আঁকড়ে ধরে কিছুতেই পারুল জুত করতে পারছে না। শুধু কি হাতই কাঁপছে, বুকের অশান্ত দাপাদাপি কিছুতেই শান্ত হবার নয়।

ছাত্রদের নয়, সেকেণ্ড মাস্টার বুঝি পারুলের পরীক্ষার খাতার ওপরই চোখ বোলাচ্ছেন। যাচাই করে নম্বর দেবেন।

পরের দিন সকালে পারুল সাহস করে বলেই ফেলল। সারা রাত শুয়ে শুয়ে ভেবেছে। একতিল ঘুমোয় নি। আলো এড়াবার জন্য চোখে হাত চাপা দিয়ে এপাশ ওপাশ। মাঝে মাঝে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখেছে। দাওয়ার ওপর সেকেণ্ড মাস্টারের বিরাট দেহ। ঝুঁকে পড়ে খাতা দেখছে একমনে। ঘাম-জবজবে পিঠ, গালে মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ির কিরীচ। চোখ ফিরিয়ে একবার দেখারও প্রয়োজন মনে করে না। শুধু সংসার সামলাবার জন্য বিয়ে করার দরকার হয়েছিল। ঘরদোর আগলাবার আর সময়মত

ভাতের থালা এগিয়ে দেবার একটি লোক। তার বেশি কিছু নয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর সেকেণ্ড মাস্টার চশমার ডাঁটিতে স্থতো জড়াচ্ছিল। কাল রাতে মশার উৎপাতে বিরক্ত হয়ে হাত নাড়তে গিয়ে চশমার ডাঁটি দু খণ্ড।

অথচ চশমা ঠিক না হলে খাতা দেখাই দুষ্কর।

পারুল সামনে এসে দাঁড়াল।

—শুনছ, আজ আমি একটু বেরোব।

ডাঁটিটা কিছুতেই মজবুত হচ্ছিল না। বার বার স্থতো ফস্কে যাচ্ছিল। বেকায়দায় ভেঙেছে, আগের মতন করে ঠিক করাই মুস্কিল।

স্থতোটা টিপে ধরে সেকেণ্ড মাস্টার মুখ তুলল।

পারুল কথাটা আবার বলল!

—কোথায়? সেকেণ্ড মাস্টারের হাত থেকে স্থতো সরে গিয়ে ডাঁটিটা খসে পড়ল।

এমন একটা স্থযোগ পারুল ছাড়ল না।

—একি চশমাটা ভাঙলে কি করে? খাতার গোছা সরিয়ে পারুল দাওয়ায় বসে পড়ল। সেকেণ্ড মাস্টারের পাশাপাশি। হাত দিয়ে ডাঁটিটা তুলে নিয়ে চোখ কুঁচকে পরীক্ষা করল।

—এমনভাবে ভাঙলে কি করে?

সেকেণ্ড মাস্টার আমতা আমতা করল।

—ওই, তোমার নাম কি, কাল রাতে মশার উৎপাতে—

কথা শেষ হবার আগেই পারুল খিলখিল করে হেসে উঠল। সারাদেহে হিল্লোল তুলে। মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে বলল, কি ভাগ্যিস, স্কুল বন্ধ, নয়তো অন্য মাস্টাররা আর কিছু ভেবে বসত।

—কি ভেবে বসত? পারুলের কাণ্ড দেখে সেকেণ্ড মাস্টার অবাক। রাতারাতি এত সাহস কি করে হল মেয়েটার।

পারুল আর কোন উত্তর দিল না। ক্ষিপ্রহাতে ডাঁটিটা বেঁধে ফেলল। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে ডাঁটিটা জোড়া দিয়ে পাকে পাকে সুতো জড়াল। শেষ হতে, হাত দিয়ে টেনে দেখল বার কয়েক। তারপর চশমাটা সেকেণ্ড মাস্টারের হাতে তুলে দিয়ে বলল, দেখে নাও জিনিস। দোকানে গেলে আনা চারেক নিশ্চয় নিত।

তা নিত, কিন্তু তারা সুতো জড়িয়ে দিত না অবশ্য। ঝালাই করে আটকে দিত। তা হোক, এতেই কাজ চলে যাবে, অন্ততঃ খাতা দেখার কাজ আটকাবে না।

—আমি একটু বেরোচ্ছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব, বুঝলে? ভাবিনীদি কদিন ধরে খবর পাঠাচ্ছে, না যাওয়াটা ভাল দেখায় না।

—কিন্তু এই রোদ্দুরে?

আবার পারুল হাসির ঝলক ছড়াল।

—তোমার বৌ বুঝি ননীর পুতুল, একটু তাপেই গলে যাবে?

এ রসিকতার সেকেণ্ড মাস্টার কোন উত্তর দিল না। খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

পারুল একবার মনে করল ঘরে ঢুকে শাড়িটা পাল্টে নেবে। মুখে ঘাড়ে পাউডারের প্রলেপ। আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে চলনসই হবার চেষ্টা। কিন্তু সময় নষ্ট করতে সাহস হল না পারুলের। বলা যায় না, সেকেণ্ড মাস্টারের মেজাজ চটতে কতক্ষণ। মেজাজ খারাপ হলেই, মত বদলে যাবে। আবার হয়তো ডেকে বসাবে পারুলকে। খাতার গোছা সামনে দিয়ে কাজে লাগিয়ে দেবে।

পারুল দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল। সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। দু এক মিনিট ইতস্তত ভাব, তারপর মন ঠিক করে ভাবিনীদির বাড়ির দিকেই পা চালাল। বলা যায় না, সেকেণ্ড

মাস্টার জানলা দিয়ে উঁকিই দেবে হয়তো। বৌ ঠিক পথে চলছে কিনা খোঁজ নেবে।

একটু ঘুরপথ হবে। তা হোক। ভাবিনীদির বাড়ির কাছ বরাবর গিয়ে বাঁ-হাতি শড়ক ধরে এগোলেই হবে। রাংচিতার বেড়া পেরিয়ে, মহাকালের মন্দিরের পিছন দিয়ে গেলে সোজা 'চাঁদিনী' সিনেমা।

পারুল তাই করল। মনে একটু ভয়ও ছিল। ভাবিনীদি সারাক্ষণ তো জানলায়। একবার দেখতে পেলেই হল। ইসারায় ডাকবে। এড়াবার উপায় নেই। একবার গেলেই ইনিয়ে বিনিয়ে সাত সতের কাহিনী। নিজের রোগবালাইয়ের কথা, গৃহস্থালীর খবর। ওটাই দায়।

ভাবিনীদির বাড়ির কাছে গিয়েই পারুল মাথার ঘোমটা টেনে দিল। কপাল ছাড়িয়ে থুতনী বরাবর। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল। না, জানলায় ভাবিনীদি নেই, ধারে কাছে কেউ নয়। পারুল মাঠে গিয়ে নামল।

এবারেও জানলা খোলা। পারুল গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল তক্তপোশের ওপর দেয়ালে হেলান দিয়ে তারাচরণ বসে। গায়ে চাদর জড়ান। অগোছাল চুলের রাশ চোখের ওপর। দু হাঁটুর ওপর মুখ রেখে কি ভাবছে এক মনে। জানলার খড়খড়িতে পারুল আলতো টোকা দিল।

আওয়াজে চমকে তারাচরণ চোখ তুলল। পারুলের সঙ্গে চোখা-চোখি হতে বিশীর্ণ ঠোঁটে হাসির আভাস। দেয়াল ধরে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিয়ে বলল, বেশ লোক যা হোক। কাল সারাটা দিন ছটফট করেছি তোমার জন্য। একবার ভাবলাম সুকুমারকে পাঠাই, কিন্তু সাহস হল না।

পারুল একেবারে অন্য কথা পাড়ল, তোমার শরীর কেমন? জ্বর আছে নাকি?

এতক্ষণ ছিল না, এবার বোধ হয় আসবে। তক্তপোশে ফিরে যেতে যেতে তারাচরণ বলল।

—এই সময় জ্বরটা আসে বুঝি? পারুলের গলায় উদ্বেগের ছোঁয়াচ।

—কাল আসে নি, তবে আজ এলে মন্দ হয় না।

—কেন?

—তাহলে সেদিনের মতন তোমার সেবাযত্নটা পাই।

পারুলের মুখে সারা শরীরের রক্ত এসে জমা হল। ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল দুটো কান। এমন কথা বলে তারাচরণ। মুখের আগঢাক নেই, লজ্জাসরমের বালাই নয়!

—এত সেবাযত্নের সাধ তো টুকটুকে একটি বৌ আনলেই তো পার।

—উঁহু, আনকোরা বৌয়ে আমার লোভ নেই। ভাবছি তাক বুঝে অন্যলোকের ঘরে সিঁদ কেটে পুরোনো জিনিস পাচার করব।

—অসভ্য কোথাকার। পরের জিনিসে হাত দিলে কি হয় জান? তক্তপোশের ওপর বসতে বসতে পারুল বলল।

তারাচরণ এগিয়ে এসে পারুলের দুটো হাত তুলে নিল নিজের হাতে। আচমকা টানে তাকে নিজের উত্তপ্ত সান্নিধ্যে নিয়ে এল। হেসে বলল,—কিচ্ছু হয় না। মন ভরে যায়। নিজের দুঃখের কথা মনেই থাকে না।

একসময়ে পারুল হেসে বলল, জান, ভাবিনীদের বাড়ি যাবার নাম করে পালিয়ে এসেছি। ঘরের মানুষ আজ ঘরেই। স্কুলের ছুটি।

—বটে, সেকেণ্ড মাস্টার ছেড়ে দিলেন যে? তারাচরণ পারুলের খোঁপার ওপর হাত রাখল। গোটা দুয়েক কাঁটা টেনে তুলল, আবার বসিয়ে দিল আস্তে আস্তে।

—কর্তার মেজাজ খুব ভাল যে এখন। কাল রাত্রে ছাত্রদের

খাতায় নম্বর যোগ করে দিলাম, আজ আসবার আগে চশমার ভাঙা ডাঁটি সারিয়ে দিলাম। খুশ মেজাজ, তাই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে বলল তথাস্তু।

—তুমি ছাত্রদের খাতা দেখছ, বল কি গো? মাস্টার মশাইয়ের মতলবটা কি? শিখিয়ে পড়িয়ে তোমাকেও বোধ হয় সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যাবেন। একলা ঘরে ফেলে যেতে সাহস হচ্ছে না।

পারুল হাসল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে বসল। ভিতরের দরজা খোলা। বলা যায় না, সেদিনের মতন হুট করে বাইরের লোক এসে দাঁড়ালেই হল। কি মনে করবে। বেপাড়ার মাস্টারমশাইয়ের বৌয়ের অজানা নিঃসম্পর্কীয় মানুষের গায়ে গা দিয়ে বসা কেন? কিসের এত খলখলিয়ে হাসি। যা রয় সয়, তাইতো ভাল।

তারাচরণ আরো সরে এল পারুলের দিকে। হেসে বলল, আমার খাতাটাও তোমার সামনে মেলে ধরব, কত নম্বর দেবে তুমি?

—নম্বর বুঝি আমি দিই, আমার কাজ শুধু নম্বর যোগ করা। যে নম্বর দেয়, তার সামনে তোমার খাতা মেলে ধরলে, গোল্লা ছাড়া কিছুই পাবে না। একেবারে ফেল। সাত জন্মে ক্লাশে উঠতে পারবে না।

কথা শেষ করে পারুল উঠে দাঁড়াল। পরনের শাড়ি গুছিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতেই তারাচরণ বাধা দিল, এর মধ্যে উঠছ কোথায়?

—বারে ঘর-সংসার নেই বুঝি আমার? একটা লোককে বসিয়ে এসেছি।

—দাওয়ায় বসিয়েছ, পথে তো আর বসাও নি।

পারুল মুখ টিপে হাসল।—তোমার মতলব বোধ হয় তাই না? ভ্রু বাঁকিয়ে পারুল তারাচণের চোখে চোখ রাখল। ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক।

—আমার মতলব শুনবে? তারাচরণ দাঁড়িয়ে উঠে পারুলকে কাছে টেনে নিল। জ্বর নেই, তবু সারা গা গরম। স্ফীত হয়ে উঠেছে হাতের শিরার জট। মদির দু চোখের দৃষ্টি, চকচক করছে পুরু ঠোঁট।

ছাড়াতে চেষ্টা করেও পারুল ছাড়াতে পারল না নিজেকে। সারা শরীর অবশ, ঠোঁটে, গালে, দু চোখের পাতায় গলানো সীসার স্পর্শ। রক্তের সমুদ্রে কূলভাঙা জোয়ার। মনে হল, এখনি বুঝি মেঝেয় লুটিয়ে পড়বে। টাল সামলাতে পারুল তারাচরণকেই আঁকড়ে ধরল।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রোদের টুকরো ঘরের মেঝেয় পড়তেই পারুল চমকে উঠল। ম্লান নিস্তেজ আলো। বেশ পড়ে এসেছে বেলা। সর্বনাশ এতক্ষণ বাইরে কাটানর কি কৈফিয়ৎ দেবে সেকেণ্ড মাস্টারের কাছে? এত অসুস্থ ভাবিনীদি, যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার পাশে বসে থাকতে হয়েছে!

—ইস্, বড্ড দেরী হয়ে গেল। পারুল আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মুছল। হাত দিয়ে ঘাড়ের ওপর ভেঙেপড়া খোঁপাটা ঠিক করে নিল।

তারাচরণ কোন কথা বলল না। শুধু দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল।

পারুল পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তারাচরণ খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, আবার কবে দেখা হবে?

পারুল ফিরে দাঁড়াল। চৌকাঠে পা রেখে বলল, এমন দেখা হয়েই বা লাভ কি? কেবল মানুষের জ্বালা বাড়ান। ভাঙামন নিয়ে কি করে আমি আর একটা মানুষের ঘর করি বল তো? দিনের পর দিন ঘরের লোকের সঙ্গে ছলনা করে চলেছি। খাচ্ছি,

দাচ্ছি, হাসছি, ফাইফরমাশ খাটছি, কিন্তু আমার বুকের ভিতর কি আগুন জ্বলছে, তা তো তোমার অজানা নয়!

এতকথা পারুল বলতে চায় নি, কিন্তু কথা শুরু করতেই নিজের অজান্তে বাঁধভাঙা স্রোতের মতন কথার পর কথা বেরিয়ে এল। এমন লুকোচুরি আর ভালও লাগছে না। কিছু একটা হয়ে যাক। সরু বাঁধের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে চলার ইতি। হয় পায়ের তলায় শুকনো মাটি আসুক, নয়তো বন্যার প্রবল উচ্ছ্বাসেই যদি হারিয়ে ফেলতে হয় নিজেকে, তাতেও পারুলের আক্ষেপ নেই।

কথা শেষ করে পারুল আর দাঁড়াল না। হনহন করে একেবারে রাস্তায় এসে উঠল। বেশ বেলা পড়ে এসেছে। 'চাঁদিনী' সিনেমার সামনে মানুষের ভিড়। পথচলতি লোকেরও কমতি নেই। রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে পারুল চলতে শুরু করল। বাড়ির সামনে এসে থামল। বাইরের দরজা একটু ফাঁক করা। সেই ফাঁকে চোখ রেখে পারুল দেখল।

সেকেণ্ড মাস্টার দাওয়াতেই বসে আছে। স্তূপাকার কাগজ সামনে নিয়ে। কোমরের কাপড় আলগা। সারা শরীর ঘামে জবজবে। নাকের নিচে একরাশ নস্য জমা হয়ে রয়েছে। কানের ওপর লাল পেন্সিল গোঁজা।

ইচ্ছা করেই পারুল দরজার একটু শব্দ করল। জোরে জোরে পা ফেলে দাওয়ার ওপর গিয়ে বসল। সেকেণ্ড মাস্টারের সামনাসামনি। আঁচল দিয়ে গলা, কানের পাশ মুছতে মুছতে বলল, ভাবিনীদির অবস্থা ভালো নয়।

—তোমার অবস্থা আরো খারাপ। গম্ভীর বাজখাঁই গলার স্বর সেকেণ্ড মাস্টারের।

দ্রুতস্পন্দন বুকের মধ্যে। কামারের হাজার হাপরের মতন।

। সর্বনাশ। পায়ে পায়ে সেকেণ্ড মাষ্টার কি বৌয়ের পিছন ধাওয়া করেছিল! চুপি চুপি পা টিপে দাঁড়িয়েছিল তারাচরণের বাড়ির সামনে! না কি ভাবিনীদির বাড়িতেই গিয়ে উঠেছিল তল্লাস করতে। কিছু বলা যায় না। সব পারে সেকেণ্ড মাস্টার। পারুল মুখ খোলবার আগেই সেকেণ্ড মাস্টার বলল, সামান্য যোগও করতে পারো না। সবই তো ভুল। আমার ডবল খাটুনি।

ও, এই ব্যাপার! পারুলের নিশ্বাস সহজ হয়ে এল, ফ্যাকাসে মুখে রক্তের সঞ্চার, ঝিমিয়ে-আসা স্নায়ু আর শিরা সতেজ। পারুল উঠে গিয়ে সেকেণ্ড মাস্টারের পাশে গিয়ে বসল। গা ঘেঁসে।

কই দেখি কোথায় ভুল?

সেকেণ্ড মাস্টার আর একটু সরে বসল। পারুলের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। হাত দিয়ে পাশে রাখা কাগজ তুলে ধরল, এই দেখো।

পারুলের লেখা নম্বরগুলোর ওপর সেকেণ্ড মাস্টার লাল পেন্সিলে ঢেঁড়া দিয়েছে। সব অঙ্ক বাতিল। আবার পাশে নতুন করে হিসাব কষেছে। আলাদা হিসাব। সেকেণ্ড মাস্টারের নিজের।

বাড়তি পরিশ্রমের জন্যই মেজাজ তিরিক্ষে। সেকেণ্ড মাস্টার আবার ভ্রু কোঁচকাল, আশ্চয, সামান্য যোগ, দু এক ক্লাশের ছেলেরাও বোধ হয় পারে।

বাঁকা বাঁকা কথায় পারুল একটুও রাগল না। ভালই হয়েছে। পারুলের হিসাব আর সেকেণ্ড মাস্টারের হিসাব যে এক নয়, তা সেকেণ্ড মাস্টার ভাল করেই জানুক। শুধু তো হিসাবেই পারুল ভুল করেছে, কিন্তু সেকেণ্ড মাস্টার ভুল করেছে, নিজের জীবনে। পারুলের মতন মেয়েকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। সে হিসাবে কে ঢেঁড়া দেবে লাল পেন্সিল দিয়ে। যোগফল নাকচ করে কে লিখবে নতুন হিসাব!

—ভুল তো তুমিই করেছ? পারুল বলতে ছাড়ল না।

—আমি !

—নিশ্চয়, বউকে দিয়ে যদি ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখাতে সাধ, তো পাশ করা বিদ্যাধরী বউ আনলে পারতে।

ব্যস আর কথা নয়। জোঁকের মুখে নুন ছিটিয়ে দেওয়ার মতন কিংবা সাপের সামনে ঈষের মূল। ফণা গুটিয়ে সেকেণ্ড মাস্টার খাতার আড়ালে চলে গেল। দুমদাম পা ফেলে পারুল ঢুকল ঘরের ভিতর। বেলা পড়ে গেছে, শোবার সময় আর নেই, কিন্তু পারুল গামছা দিয়ে ঘরের মেঝে মুছে আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল। সাত তাড়াতাড়ি উনানে আগুন দিয়েই বা কি লাভ। দশ তরকারি ভাত তো আর নয়। তেমন ঘরেই যেন পড়েছে পারুল। সাধ নেই, শখ নেই মানুষটার, কোন দিন ভালমন্দ খাওয়ার ইচ্ছাও নয়। দিনের পর দিন শাকভাতে যেমন অরুচি নেই, তেমনি খেটেখুটে শরীর ঘামিয়ে কোনদিন কোন নতুন জিনিস রেঁধে পাতে দিলেও, ভুলেও কিছু বলবে না। মাথা হেঁট করে খেয়ে যাবে। জোর করে কিছু জিজ্ঞাসা করলেও, উল্টো সুর গাইবে, কি দরকার পয়সার শ্রাদ্ধ করে এসব করবার। আমরা যেমন মানুষ, আমাদের শাকভাতই ভাল। কথা তো নয়, যেন বিছুটির স্পর্শ। সারা গা জ্বালা করে ওঠে। পারুলের ইচ্ছা হতো বাকি তরকারিটা খিড়কির পুকুরে ছুঁড়ে ফেলতে। এমন মানুষকে আবার সাধ করে কেউ কিছু খাওয়ায় !

শুল বটে কিন্তু পারুল চোখ বন্ধ করল না। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে এদিক ওদিক সব দেখল।

দড়ির আলনার ওপর সেকেণ্ড মাস্টারের ময়লা চাদর ঝুলছে, একেবারে কোণে সহস্রছিন্ন ছাতিটা খবরের কাগজ দিয়ে জড়ান। জরাজীর্ণ বিছানা। তোষক ফেঁসে তুলোর ইসারা। বিয়ের সময়কার ট্রাঙ্ক। উঠানের এপাশে পারুলের চটির একটা পাটি দেখা যাচ্ছে। বাকিটা উধাও।

বিয়ের দিন কয়েক পরেই উঠানের কাদা বাঁচাবার জন্য পারুল চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে নিয়েছিল কিন্তু উঠানে নামবার মুখেই বাধা। দরজার কাছে সেকেণ্ড মাস্টার। বাজার থেকে ফিরছিল।

—ওটা কি চামড়ার? ভারি ভরাট কণ্ঠ।

পারুল চমকে উঠেছিল। দু এক মিনিট কথা বলতে পারেনি। চোখ তুলে দেখেছিল, সেকেণ্ড মাস্টারের চোখের দৃষ্টি নতুন চটির ওপর। আস্তে আস্তে বলেছিল, হ্যাঁ।

—তা হলে ওটা ছাড়তে হবে। ঘরে নারায়ণশিলা রয়েছেন, রান্নাঘরে অগ্নি। তাছাড়া বাড়ির বৌ জুতো ফটফটিয়ে বেড়াবে এমন রেওয়াজ এখানে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে পারুল চটিজোড়া খুলে ফেলেছিল। সন্তর্পণে দরজার এপাশে জড়ো করে রেখেছিল। আর পরেনি। একপাটি ইঁদুরে হয়তো কখন টেনে বাইরে নিয়ে ফেলে থাকবে। বাকি পাটিটা এখনও রয়েছে।

পারুলরাও বড়লোক মোটেই নয়। বরং কষ্টের সংসার। একদিক টানতে আর একদিকের অবস্থা বে-আব্রু। কিন্তু ঘরদোরের চেহারা এমন হাঘরে-প্যাটার্ণ নয়। মনে মনে কত স্বপ্ন ছিল পারুলের। সমবয়সী বান্ধবীদের বিবাহোত্তর-জীবনের ঝকঝকে ছবি, মনের মানুষের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দেওয়ার মনোজ্ঞ কাহিনী, সব মিলিয়ে পারুলের মনেও রঙে রেখায় পরিচ্ছন্ন এক ছবি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বাসর রাতেই সে স্বপ্ন বাতাসে মিশে গেছে। মানুষ আর মানুষটার জীবনযাত্রার শ্রী দেখে পারুলের চোখের জল বাধা মানেনি। তারপর প্রতি পদে খিটিমিটি, প্রতি কাজে অমিল। ক্রমেই ভেঙে পড়ছে পারুলের মন। কোনরকমে তবলায় ঠেকা দিয়ে যে জীবন চলে না, চলতে পারে না, সে সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ।

খড়মের শব্দে পারুলের হুঁশ হল। সেকেণ্ড মাস্টার খিড়কির পুকুরের দিকে গেল। মুখহাত ধুয়ে এখনি হয়তো খেতে চাইবে কিছু। কিছু মানে, মুড়ি-নারকোল, কিংবা মুড়ি-বাতাসা। কোনটাই নেই ঘরে।

পারুল ওঠবার আগেই সেকেণ্ড মাস্টার কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। মিনিট দশেক। তারপরই ফিরল কাগজের ঠোঙা হাতে। দু ঠোঙা মুড়ি। একটা ঠোঙা চৌকাঠের পাশে রেখে আর একটা ঠোঙা কোলের ওপর নিয়ে বসল। পারুলের হঠাৎ মনে হল আরো একটা জিনিস রয়েছে ঘরে। দিন কয়েক আগে সেকেণ্ড মাস্টার একজোড়া শশা হাতে ফিরেছিল স্কুল থেকে। কিনেই এনেছিল বোধ হয়, কিংবা কোন ছাত্রের উপঢৌকন হওয়াও বিচিত্র নয়। রান্না-ঘরের তাকের ওপরই পড়ে আছে সেদুটো, ছাড়াবার কথা আর পারুলের মনেই ছিল না।

উঠি উঠি করেও পারুলের আর উঠতে ইচ্ছা করল না। এ সংসারের পরিবেশই ওর ভাল লাগছে না। সেকেণ্ড মাস্টারের স্কুল নির্মম দুটি হাত যেন ওর গলায় চেপে বসেছে। দমবন্ধ হবার দাখিল। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

মুড়ি শেষ করে সেকেণ্ড মাস্টার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেখল পারুলের দিকে।

—কি, শরীর খারাপ?

পারুল কোন উত্তর দিল না। আঁচল মুখে চাপা দিল।

—তখনই বারণ করেছিলাম, এত রোদে বেরিও না। এখন জ্বর-জারি হলেই ঝঞ্ঝাট। সেকেণ্ড মাস্টার চৌকাঠ থেকে সরে গেল দাওয়ায়, খড়মের শব্দে মনে হল সেখান থেকে নেমে দাঁড়াল উঠানের ওপর।

পারুল দাঁতে দাঁত চেপে রইল। সাত জন্মে অসুখ-বিসুখ

পারুলের হয় না। অন্তত ওর জ্ঞান হয়ে অবধি কিছু কখন হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। অসুখ হবার নামেই সেকেণ্ড মাস্টার শিউরে উঠেছে। কি জানি যদি ডাক্তার বদ্যি ডাকতে হয়! তুবেলা তুমুঠো খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তার চেয়ে জ্বর হলে বোধ হয় সেকেণ্ড মাস্টার বৌয়ের পা ধরে মাঠেই ফেলে দিয়ে আসবে। কোন ঝক্কি সইবে না।

কালো স্তূপাকার মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের ইসারার মতন, এ সংসারের কুৎসিত আবহাওয়ার পাশে পাশে তারাচরণের মুখ ভেসে আসে। করুণায় কোমল, দরদে পরিপূর্ণ, শান্ত মুখ। প্রাণ দিতে পারে পারুলের জন্য। ঝড়ঝাপটা থেকে বাঁচাতে পারে তুহাত দিয়ে আগলে। মনের মানুষ আর সাজানো সংসার। এই তো চেয়েছিল পারুল। ঠিক এমনি মানুষ, আর এমনি পরিবেশ। নিশ্বাস ফেলে পারুল উঠে বসল। এইবেলা উনানে আঁচ না দিলে ঠিক সময়ে সেকেণ্ড মাস্টারের সামনে থালা ধরতে পারবে না। সময়মত খোরাক না পেলে সেকেণ্ড মাস্টার তেতে আগুন। বাঘের মতন শুধু গর্জনই নয়, আঁচড়ে কামড়ে একাকার করবে।

ভাতের হাঁড়ি চাপাবার সঙ্গেই দরজায় শিকলের শব্দ। পারুল চমকে উঠল। সর্বনাশ, তারাচরণের লোক এল বুঝি কোন খবর নিয়ে। সেকেণ্ড মাস্টার দরজার সামনেই পায়চারি করছে। তুজনে মুখোমুখি হলেই কেলেঙ্কারি।

হলও তাই। সেকেণ্ড মাস্টার দরজা খুলে দাঁড়াল। চাপা কথাবার্তা। কান পেতেও পারুল কিছু শুনতে পেল না। আস্তে আস্তে উঠে পারুল রান্নাঘর থেকে নেমে উঠানে এসে দাঁড়াল ঘুঁটে নেবার ছল করে। দরজার কাছাকাছি গিয়েও কিছু কানে এল না।

সেকেণ্ড মাস্টার দরজার কাছ থেকে সরে এসে ঘরের ভিতর গিয়ে

ঢুকল। মিনিট পাঁচেক, তারপরই বেরিয়ে এল কাঁধে গামছা।

পারুলের সঙ্গে উঠানেই দেখা।—আমাকে এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরতে হবে।

—এক ঘণ্টার মধ্যে? কোথায়?

সেকেণ্ড মাস্টার মুখ তুলে চাইল। অবাকদৃষ্টি কৈফিয়ৎ চাইবার ধরনে।

আস্তে আস্তে বলল, জগদীশবাবু, আমাদের স্কুলের নিচুক্লাশের ভুগোলের মাস্টার, তাঁর কলেরা হয়েছে। ভদ্রলোক একা থাকেন, দেখাশোনা করার কেউ নেই। তাই সবাই ঠিক করেছে, পালা করে রাত জেগে তাঁর সেবা করতে হবে।

—সেবা করতে হবে? তোমাকে? কেন গাঁয়ে ডাক্তারবদ্যি নেই।

—ডাক্তারবদ্যি সেবা করে না, চিকিৎসা করে। যাক্, আমাকে তাড়াতাড়ি করে যা হোক কিছু দিয়ে দাও। পথও বড় কম নয়। একেবারে ঘোষালপাড়ার শেষদিকে।

কথা শেষ করে সেকেণ্ড মাস্টার খিড়কির পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল।

রান্না আর কি। ভাত, ডাল আর একটা ভাজা। কড়া নামিয়েই পারুলের খেয়াল হল। সারারাত সেকেণ্ড মাস্টার বাইরে কাটাবে, বাড়িতে বুঝি একলা থাকবে পারুল। না বাপু, সে পারবে না। মাঝরাত্তিরে ঘাটে যেতে হলেই গা ছমছম। তারপর চোর-ছ্যাঁচড়ের কথা বলা যায়! বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই শুনলেই সুযোগ নেবে। শহর নয় যে, এক বাড়ির চীৎকার আর এক বাড়ি গিয়ে পৌঁছবে। একটু গোলমালেই লোকারণ্য। এখানে চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কারুর কানে যাবে না আওয়াজ। নিশুতি রাতে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসবে না।

সেকেণ্ড মাস্টারকে খেতে দিয়ে পারুল কথাটা পাড়ল।

—সারারাত একলা থাকব নাকি আমি ?

সেকেণ্ড মাস্টারের মুখে ভাতের ডেলা। ঘাড় নাড়ল প্রথমে, তারপর চিবানো শেষ হলে বলল, উঁহু, পঞ্চুকে আসতে বলে দিয়েছি।

—পঞ্চু ! পঞ্চু আবার কে ?

—স্কুলের ছোকরা চাকর। নিবারণবাবু পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন।

নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত ভাব। যুবতী বৌ একলা বাড়িতে পড়ে থাকবে তার জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই, চিন্তার একটা রেখাও নেই সারা মুখে।

—বাচ্ছা একটা চাকরের ভরসায় রেখে যাবে আমাকে ? পারুল ভ্রূ কোঁচকালে।

—জোয়ান মদ্দ আর কোথা থেকে জোগাড় করব।

কথার ধাঁজে পারুল পরিহাসই ভেবেছিল, কিন্তু মুখ তুলেই সংশয় কাটল। খুব গম্ভীর মুখ সেকেণ্ড মাস্টারের। থমথমে।

পঞ্চু এসে পৌঁছোল আধ ঘণ্টার মধ্যেই। একেবারে বাচ্ছা। বছর বারো তেরো। আচ্ছা জোয়ানের ভরসায় বৌকে একলা রেখে যাচ্ছে সেকেণ্ড মাস্টার। রোগা লিকলিকে চেহারা। দুহাতে গোটা পাঁচেক মাদুলি। পেটের ওপর মস্ত চাকা দাগ। পিলে পোড়ানোর এসেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। প্রথমে সেকেণ্ড মাস্টার, তারপর পারুলকে।

—পঞ্চু, দাওয়ায় শুয়ে থাকবি বুঝলি। কাল ভোরে আমি ফিরলে স্কুলবাড়ি চলে যাস। খুব নরম গলায় সেকেণ্ড মাস্টার বলল।

কথা শেষ হবার আগেই পঞ্চু ঘাড় কাত করল। আর বলতে হবে না। খুব বুঝেছে। এ আর এমন কি শক্ত কাজ।

কাজ অবশ্য শক্ত কিছু নয়, কিন্তু পারুল শোবার আগে দরজা বন্ধ

করতেই পঞ্চু বলল, মা ঠাকরুণ, ও মা ঠাকরুণ!

৷রুল দরজা খুলল, কিরে কি বলছিস?

মানে বলছি, মাঝের দুয়োরটা অমন করে বন্ধ করবেন না।

—সে কি, সারা রাত দরজা খোলা থাকবে এমনি ভাবে?

—থাক না, আমি তো রয়েছি দাওয়ায়।

হাসি এল পারুলের। প্যাঁকাটি লাঞ্ছিত চেহারা। জোর বাতাসেই বোধ হয় ছিটকে পড়বে মাটিতে। তারই ভরসায় দরজা খুলে রাখবে পারুল সারারাত। তা কখন হয়!—উহুঁ, সারারাত আমি দরজা খুলে রাখতে পারব না।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। চাপাগলায় বলল, মাঠাকরুণ, এদিকে চোর-ডাকাতের উৎপাত কি খুব বেশী?

ঠোঁট কামড়ে পারুল হাসি চাপল। বলিহারি বুদ্ধি সেকেণ্ড মাস্টারের। বেছে বেছে আগলাবার আচ্ছা লোক ঠিক করেছে।

এমন সুযোগ পারুল ছাড়ল না। গম্ভীর গলায় বলল, চোরডাকাতের উপদ্রব এদিকে একটু বেশীই। এই তো দিন চারেক আগে বাজারের সামনে হলদেপানা কোঠাবাড়ি, চোর ঢুকে বুড়ীকে একেবারে দা দিয়ে কুপিয়ে—

কথা শেষ হবার আগেই পঞ্চু বালিশ বগলে লাফিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। একেবারে পারুলের পিছনে। একটু দম নিয়ে বলল, তা হলে দরজাটা বন্ধই করে দিন মাঠাকরুণ। সাবধানের মার নেই।

পারুল মুখে আঁচল চাপা দিল। পাক দিয়ে উঠছে হাসির তোড়। রোধ করাই দায়। চৌকাঠের একোণে পঞ্চু শুয়ে পড়ল। মেঝের ওপর।

পারুল শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে স্কুলবাড়িতে কি করে থাকিস?

—আমরা সাতজন থাকি মাঠাকরুন। সব দরোয়ান বেয়ারা একসঙ্গে।

—তাই বল। পারুল আর কথা বাড়াল না। ওপাশ ফিরে শুল।

মাঝরাত্তিরে আচমকা ডাকে পারুলের ঘুম ভেঙে গেল।

—মাঠাকরুন, ও মাঠাকরুন।

ধড়মড় করে পারুল উঠে পড়ল। কে ডাকছে? তারপরই পারুলের পঙ্কুর কথা মনে পড়ে গেল।

—কিরে?

—একটু দাঁড়াবেন মাঠাকরুণ, বাইরে যাব।

পারুলের ইচ্ছা হল চৌকাঠে ঠক ঠক করে মাথা খোঁড়ে। কি চমৎকার লোকেরই বন্দোবস্ত করেছে সেকেণ্ড মাস্টার। আগলানো চুলোয় যাক, সামলাতেই পারুলের প্রাণান্ত।

দরজা খুলে পারুল দাঁড়াল। মিনিট পাঁচেক। তার মধ্যেই পঙ্কু ফিরে এল।—ব্যস; এবারে শুয়ে পড়ুন মাঠাকরুন। কোন ভয় নেই।

সেকেণ্ড মাস্টার ফিরল ভোর বেলা। ঝাঁটপাট সেরে সবে পারুল কাপড় কাচতে যাচ্ছে, দরজার কড়া নড়ে উঠল।

পঙ্কু দাওয়ায় বসেছিল, উঠে দরজা খুলে দিল।

সেকেণ্ড মাস্টার ঢুকেই খিড়কীর পুকুরের দিকে রওনা হল। ঘাটের কাছ বরাবর পারুলের সঙ্গে দেখা।

পারুল কাপড় টেনে পিঠ ঢাকা দিল। আলতো ঘোমটা টানল মাথায়, তারপর বলল, কেমন আছেন ভদ্রলোক?

—একটু ভাল। সেকেণ্ড মাস্টার চলতে চলতেই উত্তর দিল।

সেকেণ্ড মাস্টার জলে নামতে পারুল ঘাটের কাছে গিয়ে বসল। স্নান করতে সেকেণ্ড মাস্টারের বেশ সময় নেবে। এক ঘণ্টা ধরে

সূর্যস্তব, গায়ত্রীজপ। গোটা কুড়ি ডুবই দেবে। ওই কচুরীপানা আর পচা দাম সরিয়ে।

—আগলাবার কি লোকই রেখে গেছ? পারুল থালা মাজতে মাজতে বলল।

গামছা দিয়ে সেকেণ্ড মাস্টার শরীর রগড়াচ্ছিল, থেমে বলল, কেন?

—কেন আবার। মাঝরাত্তিরে বাইরে যেতে হলে আমাকে দাঁড়াতে হয়। দাওয়ায় শুয়েছিল, তারপর ভয় পেয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

—আগলাবার জন্য তো আর ওকে রাখিনি। একেবারে একলা থাকার চেয়ে একজন সঙ্গে থাকা ভাল।

উত্তর দিতে গিয়েই পারুল অবাক। মানুষটা নেই। জলের তলায় ডুব দিয়েছে। যখন উঠল তখন কিছু বলবার উপায় নেই। মুখে মন্ত্র শুরু হয়েছে। ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। পারুল একমনে হাতের কাজ সারতে লাগল।

সারাটা দুপুর ঘুমিয়ে বিকাল নাগাদ আবার সেকেণ্ড মাস্টার তৈরী। পঞ্চু তখনও এসে পৌছায় নি। সকালে মুড়ি খেয়ে গেছে, সন্ধ্যার মধ্যেই চলে আসবে এমনি কথা ঠিক রয়েছে।

আমি রওনা হচ্ছি, পঞ্চু এখনি এসে পড়বে।

উত্তরের জন্য সেকেণ্ড মাস্টার আর দাঁড়াল না। লাঠি ঠুকে ঠুকে চৌকাঠ পার হয়ে গেল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে পারুল উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল। নিচু হয়ে ঝাড়ু চালাতে চালাতে গা-গতর ব্যথা। কাঁকাল বেশ কনকন করছে। শুকনো পাতা, ধুলো কুলতলায় জড়ো করে দরজায় খিল দিতে গিয়েই মুশকিলে পড়ল।

দরজা চাপবার আগেই বাইরে থেকে ঠেলা। পারুল একপাশে সরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তারাচরণ চৌকাঠ পার হয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল।

বাতি জ্বালান হয় নি। আবছা অন্ধকার। মানুষ দেখা যায়, চেনা যায় না। চোখ কুঁচকে পারুল দেখল। অচেনা লোক ভেবে আঁচল খুলে ঘোমটা দিতে গিয়েছিল, জানা মানুষ দেখে হাত নামাল।

—একি তুমি?

—কেন, আসতে নেই? তারাচরণ উল্টো প্রশ্ন করল।

রুমাল বের করে ঘাড় মুখ মুছল। কোঁচা দিয়ে জুতো জোড়া ঝেড়ে নিয়ে বলল, দেখলাম সেকেণ্ড মাস্টার হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছেন। হাতে ইয়া মোটা লাঠি। আমার খোঁজে নাকি? পাশ কাটিয়ে প্রাণ বাঁচালাম।

তারাচরণের বলার ধরনে পারুল হেসে ফেলল।

কাছে সরে এসে বলল, সেকেণ্ড মাস্টার নাই বা রইল, তার চর রয়েছে। রাম নেই কিন্তু রামানুদাস আসছে ঘাঁটি আগলাতে।

—কি রকম? রুমাল ঝেড়ে তারাচরণ দাওয়ার ওপর চেপে বসল। ফর্সা জামাকাপড়ের মায়া ত্যাগ করে।

—বারে, চেপে চুপে বসছ যে? বাড়ির লোক ফিরে আসবে যে এখনি? পারুল কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—উঁহু, আজ রাতে আর ফিরছেন না, তা জানি।

পারুলের দু চোখে বিস্ময়ের ছিটে। হাত গুণতে পারে না কি তারাচরণ। সেকেণ্ড মাস্টার এমন একটা খবর তারাচরণের কানে কানে বলবে, এও বিশ্বাস্য নয়। তবে? ব্যাপারটা তারাচরণই খুলে বলল।

বাণী প্রেসের মালিক বুঝি সেকেণ্ড মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কথাটা। উত্তরে সেকেণ্ড মাস্টার দাঁড়িয়ে সবিস্তারে বলেছিল সব। জগদীশবাবুর অসুখের কথা, রাত জেগে সেবা করার কাহিনী। পাশের পানের দোকানে তারাচরণ দাঁড়িয়েছিল। মিঠে পান কিনছিল, জর্দার

ছিটে দেওয়া। কান পেতে সব শুনেই আর দাঁড়ায় নি। জোর পায়ে পারুলের কাছে এসে হাজির।

কিন্তু বেশীক্ষণ তোমার বসা চলবে না। এখনি পঞ্চু এসে পড়বে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে পারুল চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখল দরজার দিকে। বলা যায় না, পঞ্চু হয়তো হঠাৎ এসে দাঁড়াবে। মাস্টার মশাইয়ের দাওয়ায় উটকো লোক দেখলেই চমকে উঠবে। তাল বুঝে মাস্টারের কানেই তুলবে কথাটা।

—বেশ, তাহলে রাত করেই বরং আসব। উঠতে উঠতে তারাচরণ বলল।

—রাতে ?

—হ্যাঁ, তোমার পঞ্চুচন্দর তো ভোঁস ভোঁস করে নিদ্রা যাবে। অসুবিধা কিসের ?

অসুবিধা। একটু অসুবিধা আছে বৈ কি। কিন্তু অসুবিধার কথা বলতে গিয়েই পারুল থেমে গেল। একদৃষ্টে তারাচরণ চেয়ে রয়েছে। দু চোখে অনুনয় আর মিনতি। বার বার এমনি করে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেবে পারুল! এত সুযোগ সুবিধা থাকতেও মনের মানুষকে কাছে আসতে দেবে না। সত্যিই তো, এমন আর কি অসুবিধা। পঞ্চু তো ঘরের ভিতরেই থাকবে। বাইরে থেকে শিকল দিয়ে চলে আসার পক্ষে কোন বাধা নেই পারুলের। তারপর সারারাত দাওয়ায় বসে দুজনের আলাপ-আলোচনা, ইনিয়ে বিনিয়ে মনের কথা। ভোর হবার আগেই তারাচরণকে বিদায় দিয়ে গুটি গুটি নিজের বিছানায় গিয়ে শোয়া।

—আসব রাত্রে ?

—আসবে ? পারুলের ঠোঁট কেঁপে উঠল। অস্পষ্ট গলার স্বর। ভয়-জড়ানো।

—সিনেমার শো শেষ হতে সাড়ে এগারোটা। বারোটা নাগাদ আসব, কেমন ?

পারুল ঘাড় নাড়ল।

তারাচরণ বাইরে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিকল নাড়ার শব্দ।

তখনও পারুল ঠিক একভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়িয়ে। কিছু বলা যায় না, মাঝরাত্রে হঠাৎ যদি ফিরেই আসে সেকেণ্ড মাস্টার। শরীর খারাপ কিংবা জগদীশ মাস্টার ভাল আছে, সেবার প্রয়োজন নেই, ঘরের দাওয়ায় লোক দেখে কি ভাববে। পালাবার কোন পথ নেই। একেবারে হাতে-নাতে ধরা। একটি কথাও বলা চলবে না।

শিকলের আওয়াজে পারুলের চমক ভাঙল। ফিরে বলল, দরজা খোলাই আছে পঞ্চু, ঠেলে ভিতরে এস।

দরজা খুলে গেল। প্রথমে মোটা বাঁশের লাঠির খানিকটা, তারপর পাগড়ি মাথায় লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারার এক হিন্দুস্থানী। উঠানে পা দিয়ে মাথা হেলাল। প্রণাম মাইজী, মাস্টারবাবু পাঠিয়ে দিলেন।

—কিন্তু পঞ্চু, পঞ্চু আসবে না ? পারুলের কথা আটকে গেল। ঢোঁক গিলে বহু কষ্টে বলল।

—না মাইজী। ছেলেমানুষ, তার ডর লাগে। তাই মাস্টারবাবু বললেন, ভজন সিং, তুমিই যাও। মাইজী একলা আছেন। ঠিক আছে, কুছু ফিকির করবেন না। দরজার সামনে শুয়ে থাকব, দুশমনের বাপের সাধ্যি নেই ভজন সিংকে ডিঙিয়ে আসবে।

চোখ ঘুরিয়ে পারুল ভজন সিংয়ের চেহারাটা আর একবার দেখে নিল। দশাসই লাস। একবার ঘাঁটি আগলে শুলে, কোন দুশমনই আসতে সাহস পাবে না, তারাচরণ তো ছার।

ভজন সিং অবশ্য দরজা আগলে শুল না। সঙ্গে খাটিয়া আনলে

তাই বোধ হয় শুত। দাওয়া ঝেড়ে লাঠি পাশে নিয়ে কাত হল। মিনিট দুয়েক তারপরই নাসিকা গর্জন শুরু হল পাড়া কাঁপিয়ে।

দরজা ভেজিয়ে পারুল চৌকাঠের পাশে বসল। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দু চোখে ছিটিয়ে দিল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে না আসে। ঘুমের মধ্যে তারাচরণ ডেকে ডেকে হয়তো ফিরে যাবে, কিংবা ভজন সিংয়ের মুখোমুখি গিয়ে পড়বে। ওই মোটা তেল-চুকচুকে লাঠির এক ঘা পড়লেই তারাচরণকে আর চাঁদিনী সিনেমার তদারকি করতে হবে না।

একটু বোধ হয় ঢুলুনি এসেছিল, শিকলের শব্দ কানে যেতেই পারুল ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আস্তে দরজা খুলে পা টিপে টিপে উঠানে এসে দাঁড়াল। ভজন সিংয়ের সাড়া নেই। নাকের আওয়াজ আরও তীব্র। ভোরের আগে থামবে এমন আশা কম।

আঁচল চাপা দিয়ে পারুল দরজার খিল খুলল। খুব সাবধানে। একটু শব্দ না হয়। বাইরে তারাচরণ। হেসে কথা বলার চেষ্টা করতেই পারুল মুখ চেপে ধরল। চুপ। একটি কথাও নয়। জাঁদরেল দরওয়ান দাওয়া জুড়ে। জেগে উঠলেই সর্বনাশ। তারাচরণের হাত ধরে পারুল খিড়কির পুকুরের দিকে নিয়ে গেল। রান্নাঘরের পিছনে। বহুদিন আগে বোধ হয় ঢেঁকিশাল ছিল। ঢেঁকি নেই, কিন্তু মাটির ঢিবি রয়েছে উঁচু হয়ে। তারাচরণকে নিয়ে পারুল সেখানেই বসল। ঘেঁষাঘেঁষি।

—পঞ্চু তো বেশ ঘুমুচ্ছে নাক ডাকিয়ে। তারাচরণ চাপা গলায় বলল।

—পঞ্চু কেন হবে। অমন নাকের ডাক বুঝি পঞ্চুর। সেকেণ্ড মাস্টার বৌ আগলাতে ভোজপুরী দরওয়ান পাঠিয়েছে। পারুল মুচকি হাসল।

—বল কি ? হঠাৎ, কিছু সন্দেহ করেছেন নাকি ?

—ভগবান জানেন।

কিছুক্ষণ দুজনের কেউ কোন কথা বলল না। পারুল এগিয়ে এসে মাথা রাখল তারাচরণের কোলের ওপর। একটু পরেই খোঁপার ওপর নরম স্পর্শ পেয়েই পারুল উঠে বসল। খোঁপার ওপর হাত রেখে একগাল হাসল। কখন তারাচরণ খোঁপায় আলতো হাতে বেলফুলের মালা জড়িয়ে দিয়েছে। ফুল ঠিক নয় কুঁড়ি। ভুরভুর করছে গন্ধ।

—ছেলেবেলায় মা-ঠাকুমার কাছে দৈত্য আর রাজকন্যার গল্প শুনেছিলাম, তোমাকে আর সেকেণ্ড মাস্টারকে পাশাপাশি দেখলে সেই গল্পটার কথাই মনে পড়ে।

—কবে আবার আমাদের পাশাপাশি দেখলে তুমি ?

—একেবারে পাশাপাশি দেখব এমন ভাগ্য কি আর করেছি। ওই কাছাকাছি দেখেছি। একদিন জানলা দিয়ে। মাস্টার মশাই দাওয়ায় আর তুমি উঠানে।

পারুল পুরানো কথার খেই ধরল, তাই বুঝি তুমি রাজপুত্তুর এসেছ, রাজকন্যা উদ্ধার করতে ! হায়রে মন্দ, কেবল ইনিয়ে বিনিয়ে কথাই সার।

তারাচরণ আরো সরে বসল পারুলের দিকে। দুটো হাতে পারুলের একটা হাত ধরে বলল, পারু, চল আমরা পালিয়ে যাই কোথাও। কদিন আমি ভেবেছি কথাটা। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

পারুল বিড়বিড় করে নিজের মনে উচ্চারণ করল। অনেকবার। পারু, পারু, পারু। কি মিষ্টি ডাক, কত মধুঢালা। এই নামে ঠিক এমনি করে ডাকলে সব ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। ছাড়বার মতন কিই বা আছে পারুলের। ভাঙাচোরা সংসার আর নির্মম এক পুরুষ।

রুচিবোধের বালাই নেই। জীবনের পরিধি কেবল ছাত্রদের খাতা দেখা আর বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলা ঘরের বৌকে। মন বলে কোন পদার্থ নেই। শব্দরূপ একটু ভুল হলে যেমন ছাত্রদের পিঠে এলোপাথাড়ি বেত চালাবে, তেমনি জীবনের পথে একটু বেচাল হলে পারুলেরও নিস্তার নেই। পিঠের কাপড় তুলে বেত চালাতে একটু দ্বিধা নয়, সামান্য ইতস্তত ভাবও না। সারা পিঠ রক্তাক্ত করে দেবে। নিজে যেমন মোটা কাপড় আর আধময়লা ফতুয়ায় জীবন কাটাতে পারে, তেমনি ইচ্ছা ঘরের বৌয়েরও সাধ-আহ্লাদ কিছু থাকবে না। মাপা জীবনযাত্রা। রান্না, খাওয়া আর সেকেণ্ড মাস্টারের সেবা।

পারুল একসময়ে কেঁদে ফেলল। চেঁচিয়ে কেঁদেই সামলে নিল নিজেকে। ভজন সিং শুয়ে দাওয়ায়। মাঝরাতে মেয়েছেলের কান্নায় জেগে উঠে বসলেই কেলেঙ্কারি। মাস্টারের পরিবারের পাশে অচেনা মরদ এল কোথা থেকে।

—ওগো, কেন এমন করে কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাচ্ছ বল তো? আমি যে দিনের পর দিন কি করে এ সংসারে কাটাচ্ছি, তা ভগবানই জানেন।

—আমি মন ঠিক করে ফেলেছি পারু। আর কটা দিন। কিছু একটা বন্দোবস্ত করে ঠিক তোমাকে আমি নিয়ে যাব। তোমার এ হেনস্তা আমি চোখে দেখতে পারব না।

অন্ধকার পার হয়ে আলোর ইশারার মতন নতুন জীবনের টুকরো, স্বপ্নের ঝিলিমিলি। যৌবনের প্রথম ঊষায় মনের রক্ত দিয়ে যে কামনা পারুল লালন করে এসেছে, তারাচরণের আশ্বাসবাণীতে তারই ছোঁয়াচ।

নতুন করে জীবন শুরু। শ্লেটের ভুল অঙ্ক মুছে ফেলে নির্ভুল

হিসাবের পত্তন। তারাচরণের হাত ধরে খানা ডোবা কচুরীপানার ছিটে দেওয়া মজা পুকুর পার হয়ে নতুন পরিবেশে ঘর বাঁধা। ঘর আর ঘরের মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ নিজের মনের মত। কোথাও ফাঁক নেই, ফাঁকিও নয়।

প্যাঁচার ডাকে দুজনের চমক ভাঙল। অন্ধকার ফিকে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। পারুল উঠে দাঁড়াল, আর নয় তুমি এবার যাও। কে কোথা দিয়ে দেখে ফেলবে।

তারাচরণও উঠে দাঁড়াল। শেষরাত। দু-একটা নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে আকাশে। একটু পরেই ভোরের আলো ফুটবে। গ্রামান্ত থেকে তরিতরকারি নিয়ে লোকজন চলতে শুরু করবে। সাইকেল রিক্সার দল। কাক-পক্ষী জাগবার আগে সরে পড়াই ভাল। সাবধানের মার নেই।

খুব সাবধানে পা ফেলে তারাচরণ উঠান পার হল। দরজা ভেজানই ছিল। যাবার সময় সামান্য একটু শব্দ।

মিনিট কয়েক দেরি করে পারুল এগিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢোকার আগে ভজন সিংয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে একবার দেখল। নাকের আওয়াজ নেই, ঘুমটা তরল হয়ে এসেছে। ভজন সিং দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করে চিৎ হয়ে শুয়েছে। ঠিক সময়েই সরে পড়েছে তারাচরণ। এইবার হয়তো ওঠার চেষ্টা করবে সিংজী।

সারাটা রাত বাইরে কাটিয়ে ম্যাজ ম্যাজ করছে শরীর। চোখের পাতা টন টন। হাতদুটো ওপরে তুলে পারুল হাই তুলল। আড়মোড়া ভাঙল কয়েকবার। তন্দ্রার মুখেই চমকে উঠল। কি একটা উড়ে এসে পড়েছে গায়ের ওপর। উঃ, কি বিদঘুটে গন্ধ। জিনিসটা হাতে নিয়েই খেয়াল হল। বাঁশের আলনায় রাখা সেকেণ্ড মাস্টারের ময়লা ফতুয়া। গা-ঘিন-ঘিন গন্ধ। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে

আসার দাখিল। তারাচরণের স্পর্শ, ঘ্রাণ সব যেন নিঃশেষে ফতুয়াটা মুছে নিল পারুলের গা থেকে। সব স্বপ্নের অবসান।

দরজায় আঙুল ঠোকার শব্দে পারুলের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরের দরজা নয়, ঘরের দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে।

—কে? পারুল শাড়ি গুছিয়ে উঠে বসল।

—আমি মাইজী। ভজন সিংয়ের বাজখাঁই আওয়াজ।

—কি হল? খুলে-পড়া খোঁপাটা জড়াতে জড়াতে পারুল জিজ্ঞাসা করল।

—হয় নি কিছু। ভোর হয়ে গেছে। আমি যাব এইবার। আপনি উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিন।

পারুল উঠে দরজা খুলল। লাঠি হাতে নিয়ে ভজন সিং তৈরী। খিড়কির পুকুর থেকে বোধ হয় মুখচোখ ধুয়ে এসেছে। গালে গোঁফে জলের ছিটে।

পারুলকে দেখে একগাল হাসল, কোন তকলিফ হয় নি মাইজী? ঘুমের কষ্ট?

পারুল মুখ মচকে হাসল! ঘুম হল কোথায় যে ঘুমের কষ্ট। সারাটা রাত কাটল পুকুরপাড়ে। অবশ্য মুখে এসব বলল না।

ভজন সিংয়ের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, তোমার ঘুম হয়েছিল ভজন সিং?

ভজন সিং জিভ কেটে, দু হাত দু কানে দিল, আরে রামজী, আমি কি ঘুমোতে এসেছি এখানে মাইজী। ঘুমোবই যদি, তো পাহারা দেব কি করে।

তা তো নিশ্চয়। পারুল মুখটা গম্ভীর করে ফেলল।

ঘুমে চোখ বুজে আসছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে একটুও

ভাল লাগছে না। ভজন সিং চৌকাঠের ওপারে যেতেই পারুল দরজায় খিল দিয়ে দিল।

সবে ভোর। তাও ভাল করে আলো ফোটেনি। ঝোপে ঝাড়ে এখনও চাপ-চাপ অন্ধকার। গড়িয়ে নেওয়ার ঢের সময় রয়েছে। আঁচল লুটাতে লুটাতে পারুল ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিছানা পাতাই ছিল। কোনরকমে হাতড়ে হাতড়ে গিয়েই কাত।

মধুর স্বপ্ন। তারাচরণ আর পারুল চলেছে হাত-ধরাধরি করে। বন জঙ্গল মাঠ পেরিয়ে দ্রুত পায়ে। পিছনে অস্পষ্ট রেখায় মিলিয়ে গেল কুসুমপুর। চিহ্নমাত্রও নেই। দু পায়ে বাবলার কাঁটা। মাথায় শুকনো পাতার স্তূপ। শাড়ির আঁচল উড়ছে বাতাসে। ক্লান্তিতে সারা শরীর অবসন্ন। কিন্তু একতিল বিশ্রাম নিতে দেবে না তারাচরণ। পা মুড়ে বসবার চেষ্টা করতেই টানছে হাত ধরে—ওঠ, ওঠ, এখনি কেউ দেখে ফেলবে। চেনাজানা হাটের লোক। কিংবা পথচলতি কুসুমপুরের বাসিন্দা। উঠে পড়।

আবার ছোটা। অবিশ্রান্ত। শামুকের খোলায় পা কেটে একাকার। রক্তের ধারা এসে মিশল আলতার রেখায়। আর পারছে না পারুল।

আচমকা বেতের আস্ফালনের শব্দ। পিছনে তীরবেগে ছুটে আসছে একটা মানুষ। ঝোপে ঝাড়ে গাছে পাতায় বেত আছড়াতে আছড়াতে।

পিছন দিকে চেয়েই তারাচরণ চমকে উঠল। সর্বনাশ সেকেণ্ড মাস্টার খোঁজ পেয়ে গিয়েছে। এখনি টানতে টানতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ঘরের বৌকে। বাড়ির চৌকাঠ পার হয়ে পথে পা দেবার উপযুক্ত শাস্তি দেবে।

—শিগ্‌গির চল, এসে পড়েছে সেকেণ্ড মাস্টার।

এসে পড়েছে, কিন্তু আর পারছে না পারুল। এবার ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়বে। আসুক সেকেণ্ড মাস্টার। কাছে এলে পারুল তার দুটো পা জড়িয়ে ধরবে। ভিক্ষা চাইবে নিজেকে। এভাবে ছোটার বিরতি।

বুঝিয়ে বললে শুনবে না সেকেণ্ড মাস্টার?

খুব কাছে বেতের শব্দ। গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে, শর আর বনহোগলার শিষে। ঘাসের চাবড়ায়। দু কানে হাত চাপা দিয়ে পারুল ফিরে দাঁড়াল। তবুও নিস্তার নেই। বেতের আস্ফালন আরো স্পষ্ট। গাছে পাতায় নয়, পারুলের মনে হল বেতের আছড়ানি ওর অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, মনের ওপরই।

কি ভীষণ শব্দ। চীৎকার করে পারুল জেগে উঠল। ঘামে মাথার চুল লেপটে গিয়েছে কপালে। সারা দেহ কাঁপছে থর থর করে। ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছে কোলের ওপর, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। কিন্তু আওয়াজের কমতি নেই। আরো কাছে, আরো জোর।

একটু পরেই পারুলের খেয়াল হল। বেতের আস্ফালন নয়, খুব জোর কড়া নাড়ার শব্দ। বাইরের দরজায়। সেকেণ্ড মাস্টার বুঝি কড়া নেড়ে চলেছে।

উঠেই পারুল অবাক। চনচনে রোদ উঠানের ওপর। বেশ বেলা হয়েছে।

শাড়ি জড়িয়ে নিয়ে পারুল উঠে গেল। দরজার খিল খুলে পাশে সরে দাঁড়াল। সামনে সেকেণ্ড মাস্টার। উগ্রমূর্তি। পিছনে পথচলতি কয়েকটা লোকের জটলা। বোধ হয় দরজা ঠেলার ব্যাপার দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—আশ্চর্য ঘুম। কুড়ি মিনিটের ওপর দরজা ঠেলছি। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেল, তবু তোমার ঘুম ভাঙে না।

আঁচল দিয়ে মুখটা রগড়াতে রগড়াতে পারুল আস্তে বলল, সারারাত গরমে ঘুমোতে পারি নি। ভোরের দিকে—

চোখ তুলে পারুল সেকেণ্ড মাস্টারের দিকে চেয়ে, বাকি কথাটা আর শেষ করতে পারল না। সেকেণ্ড মাস্টারের চোখে পলক নেই। লাল ঘোলাটে চোখে একদৃষ্টে পারুলের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। এতদিন পরে বুঝি আবিষ্কার করল পারুল সুন্দরী, পারুল যৌবনবতী। পুঁথিপত্রের আড়ালে পারুল চাপাই পড়ে গিয়েছিল, সকালের সোনা-গলা রোদে এতদিন পরে বুঝি সেকেণ্ড মাস্টার খুঁজে পেল তাকে।

কিন্তু পারুলের খটকা লাগল। এতো ঠিক মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আরতি করা নয়, চোখের তারায়, মুখের ভাঁজে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল অপরিসীম ঘৃণা।

—বাড়ির বৌ, খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে এসে দাঁড়াতে লজ্জাও করে না। ফেটে পড়ল সেকেণ্ড মাস্টার।

এতক্ষণে পারুলের খেয়াল হল। নজর পারুলের দুর্বার যৌবনের দিকে মোটেই নয়, খোঁপায় জড়ানো বাসি ফুলের মালার ওপর।

আশ্চর্য মানুষ। উদ্ভট ধারণা। খোঁপায় ফুলের মালা জড়ালেই বৌ বুঝি বাইজী হয়ে যায়! পরিচ্ছন্ন সাজ গোছ করলেই অন্তঃপুরের শুচিতা নষ্ট! কিন্তু আর নয়, পারুল অনেক সহ্য করেছে। স্নো পাউডার রুজ পমেড সব ছেড়েছে সেকেণ্ড মাস্টারের জন্য, নিজের মনের সাধ আহ্লাদ সব বিসর্জন। কিন্তু যতই পারুল নিচু হয়েছে, নিজের গোদা গোদা পা দুটো দিয়ে সেকেণ্ড মাস্টার তত থেঁতলে গিয়েছে তাকে। কাদায় চেপে ধরেছে মুখ। ভেঙে ভেঙে তাকে নিজের মতন করে তৈরী করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাদার তাল নয় পারুল যে ইচ্ছা করলেই তাকে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারবে। কাঠামো ভেঙে পছন্দসই অন্য মূর্তি গড়বে।

পারুল রুখে দাঁড়াল। —কেন হয়েছে কি তাতে? ফুলের মালা কেউ আর জড়ায় না খোঁপায়? চুলে ফুল দেয় না?

আর কেউ দেয় কিনা সে খোঁজ নেবার আমার দরকার নেই। আমার বাড়িতে এ সমস্ত চলবে না। সেকেণ্ড মাস্টারের গলা রুদ্ধ আক্রোশে আরো কর্কশ শোনাল।

—আমি পরব, রোজ রাত্রে আমি ফুলের মালা কিনব, খোঁপায় জড়াব, দেখি তুমি কি করতে পার।

শেষ দিকে অসহ্য ব্যথায় পারুলের গলা ধরে এল। জলচকচক দুটো চোখ। ফুলে উঠল গলার শিরা-উপশিরা। কথা শেষ হবার আগেই সেকেণ্ড মাস্টার এগিয়ে এল। কুঁচকে এসেছে চোখ। ঠোঁটের পাশে জমাট ফেনা। উত্তেজনায় বুকটা ওঠানামা করছে।

দু হাত বুকের কাছে জড়ো করে পারুল চোখ বন্ধ করল। কঠিন একটা আঘাতের অপেক্ষায় সমস্ত শরীর টান করে দাঁড়াল। সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেকেণ্ড মাস্টার। মিনিট দুয়েক। সে সব কিছু নয়। কেবল সেকেণ্ড মাস্টার ক্ষিপ্রহাতে মালায় টান দিল। মালার সঙ্গে গোটা কয়েক চুলও ছিঁড়ে এল। দুহাতে পিষে মালাটা সেকেণ্ড মাস্টার ছুঁড়ে ছাইগাদার দিকে ফেলে দিল।

চোখ খুলেই পারুল মালাটা দেখতে পেল। সুতো ছিঁড়ে চারদিকে ফুল ছড়িয়ে পড়েছে। কয়লার গুঁড়োয় দুধ-সাদা ফুলের পাপড়ি কলঙ্কিত। এর চেয়ে সেকেণ্ড মাস্টার হাতের লাঠি দিয়ে সজোরে কয়েক ঘা দিলেও তো পারত। বড়ো জোর কপাল কেটে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ত, কিন্তু বুকের মধ্যে নিশব্দ রক্তক্ষরণের তুলনায় সেও ঢের ভাল ছিল। এ মালা পারুলের নতুন জীবনের প্রতীক, দুহাতে দলে পারুলের সেই জীবনকেই সেকেণ্ড মাস্টার মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। অবমাননা করেছে তার নারীত্বের।

একটি কথাও না বলে পারুল আবার ঘরে মধ্যে ঢুকল। কিছুক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সেকেণ্ড মাস্টার খিড়কীর পুকুরের দিকে পা চালাল।

শুয়ে শুয়েই পারুল দেখল স্নান সেরে সেকেণ্ড মাস্টার আহ্নিকে বসল। ঘণ্টা খানেক, তারপর কোঁচার খুঁট গায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। মিনিট দশেক পরে ফিরে এল বাতাসার ঠোঙা হাতে। খাওয়া শেষ করে আবার দাওয়ায় বসল পুঁথি নিয়ে। সুর করে পড়ল অনেকক্ষণ ধরে।

এদিক থেকে পারুল শুধু সেকেণ্ড মাস্টারের পিঠের খানিকটা দেখতে পেল। সারা পিঠ ঘামাচিতে লাল। ঘামের বোটকা গন্ধ। সাত জন্মে সাবান ছোঁয় না সেকেণ্ড মাস্টার। এগিয়ে দিলেও সরিয়ে দেয় হাত দিয়ে।

চোখ বন্ধ করে পারুল ঘুমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু অসম্ভব। দুচোখে অসহ্য দাহ। বুকের মাঝখানে তেরচাভাবে কাঁটা বিঁধে রয়েছে। একটু এপাশ ওপাশ করতে গেলেই টনটনিয়ে ওঠে ব্যথা। এ জীবন চায়নি পারুল। কোনদিন নয়। এ কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে যে শান্তি পায় পাক, পারুলের এমন জীবনে কোন লোভ নেই।

একটু বোধ হয় পারুলের তন্দ্রাই এসে থাকবে, হঠাৎ মনে হল সেকেণ্ড মাস্টারের গুণগুণানী থেমে গেছে। মানুষটাকেও দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। আস্তে আস্তে পারুল উঠে পড়ল। না, দাওয়াতেও কেউ নেই। উঠানেও না। গেল কোথায় মানুষটা। দরজা টানতে গিয়েই বাধা। বাইরে তালা দেওয়া। পুরানো নাটকের পুনরাবৃত্তি। এর বেশি কিছু ভাববার শক্তি বোধ হয় সেকেণ্ড মাস্টারের নেই। বৌকে শাসন করার এই একটি কায়দাই জানা। কারণে অকারণে একই কসরত!

উঠান থেকে দাওয়ায় উঠতেই চোখাচোখি। জানলার ওপাশে তারাচরণ। উজ্জ্বল দুটি চোখ, হাসিতে সারা মুখ উদ্ভাসিত। নৈরাশ্যের মেঘের ফাঁকে আশার বিদ্যুৎ। পারুল ছুটে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু ওই দাঁড়ানই সার। একটি কথাও বলতে পারল না। অঝোরে কান্না। চোখের জল গাল বেয়ে বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিল।

—কি এত কান্না কিসের? এদিক ওদিক চেয়ে তারাচরণ জিজ্ঞাসা করল।

—আমি আর পারছি না গো। এ নরক থেকে তুমি আমায় উদ্ধার কর। হাত ধরে যেখানে খুশি নিয়ে চল।

জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে তারাচরণ হাত বাড়িয়ে পারুলকে ছুঁল। চুলে হাত দিল, গালের জল মোছাবার চেষ্টা করল তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি সেই কথা বলতেই এসেছি পারু। চাঁদিনী সিনেমা দেখা শোনা করার একটা বন্দোবস্ত হয়েছে। আজ রাতেই আমরা চলে যাব। এখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে স্টেশন। সেখান থেকে রেলে চেপে কাঞ্চন নগর।

এর বেশি আর তারাচরণ বলতে পারল না। কে একজন এগিয়ে আসছে। জানলা ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা চলে যেতে আবার ফিরে এল।

—তোমার কর্তা তো আজকেও বেরোবেন সেবায়?

—কি জানি। বোধ হয় বেরোবে।

ঠিক আছে সন্ধ্যার একটু পরেই তুমি চলে এস। জিনিসপত্র বেশি নেবার দরকার নেই। শুধু শাড়ি আর গয়না, ব্যস। আমি বাড়ির সামনেই থাকব। দেরি কর না লক্ষ্মীটি।

পারুল ঘাড় নাড়ল। দেরি করবে কি। পারলে এখনি চলে যায়। এক কাপড়ে।

—আমি চলি পারুল। গরাদ ছেড়ে তারাচরণ মাঝ রাস্তায় সরে দাঁড়াল।

সকাল থেকে একটি দানা পেটে পড়েনি পারুলের। ব্যথায় দেহ মোচড় দিয়ে উঠছে। অবশ্য হাতের কাছে খুচরো পয়সা যা আছে, তাতে মুড়ি কেনা চলবে কিন্তু কিনতে সেই পারুলকেই যেতে হবে। এই রোদে আর বেরোতেই ইচ্ছা করল না। সেকেণ্ড মাস্টারের ভিটেয় জলস্পর্শ নয়।

টিনের ট্রাঙ্ক খুলে পারুল গোছাতে আরম্ভ করল। কখানাই বা শাড়ি। সবই শত ছিন্ন, সেলাইয়ের কারসাজি। এতদিন বিয়ে হয়েছে হাতে করে কোনদিন সেকেণ্ড মাস্টার ভাল শাড়ি একটা কিনে দেয়নি। মোটা চটের মতন কাপড়, গা-জ্বালানো পাড়। কলকাতা শহরে ঝিরাও ছোঁয় না হাত দিয়ে। আর গয়না! হার আর দু হাতে সরু চুড়ি। সোণা ক্ষয়ে ব্রোঞ্জ উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। মাকড়ির অবস্থাও তথৈবচ। সম্বলের মধ্যে এই। তারাচরণের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে এই আবরণ আর আভরণে নিজেকে সাজিয়ে!

দরজার শব্দ হতেই পারুল ট্রাঙ্ক বন্ধ করে সরে এল।

দরজা ঠেলে সেকেণ্ড মাস্টার উঠানে পা দিল। পিছনে আরো একজন। কোণে দাঁড় করানো মাদুর পেতে দুজনে বসল মুখোমুখি। দরজার এপাশে পারুল কান পেতে দাঁড়াল।

কথাবার্তায় মনে হল স্কুলের মাস্টার। ছেলেদের পরীক্ষার কথা, পাশ ফেলের আলোচনা চলেছে। আসন্ন ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে গবেষণা।

পারুলের সারা শরীর জ্বালা করে উঠল। ঘরে একজন উপবাসী, পেটে কিছু পড়ে নি, সকাল থেকে নিরম্বু, সেদিকে খেয়ালই নেই। লোক জুটিয়ে এনে যত রাজ্যের বাজে কথা।

দেয়ালে হেলান দিয়ে পারুল বসল। কোন রকমে রান্নাঘরে যেতে পারলে হয়। উনান ধরিয়ে চালে ডালে মিশিয়ে পিত্তরক্ষার ব্যবস্থা। কিছু একটু মুখে না দিলে চলবে না। বিদেশ-বিভূঁয়ে কখন কি জুটবে ঠিক আছে!

ঘণ্টাখানেক পরই লোকটি উঠে দাঁড়াল। বগলে খাতার বাণ্ডিল। সেকেণ্ড মাস্টারই তুলে দিল। লোকটি দরজার কাছ বরাবর যেতেই পারুল পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে উঠল।

রান্না শেষ করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মাস্টারের ঠাঁই করতে যেতেই বিপত্তি। দাওয়ার কোণে বসে সেকেণ্ড মাস্টার চটির পেরেক ঠিক করছিল। আধলা ইঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে সায়েস্তা। বোধ হয় বাগে আনতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই মেজাজ তিরিক্ষে। আসন পাতার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রু কোঁচকাল সেকেণ্ড মাস্টার।

—আজ অমাবস্যা।

তাই বুঝি। তাহলে তো মুড়কি আর বাতাসা ছাড়া সেকেণ্ড মাস্টার কিছুই মুখে দেবে না। এতগুলো চাল নষ্ট। তা পারুলেরই বা দোষ কি। পাঁজি হাতে করে বসে থাকবে নাকি বাড়ির বৌ। পাতা উল্টে তিথি নক্ষত্র দেখবে। কবে অমাবস্যা, পূর্ণিমা সেই বুঝে ব্যবস্থা।

কোন কথা না বলে পারুল আসন উঠিয়ে নিল। খাওয়া দাওয়া সেরে রান্নাঘরের দরজা টেনে দিয়ে যখন বাইরে এল, তখন রোদের তেজ কম। বিকালের আমেজ ঘনিয়ে এসেছে। দাওয়ায় তাকিয়া মাথায় সেকেণ্ড মাস্টার ঘুমে অচেতন। পা টিপে টিপে পারুল ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

ওরই মধ্যে বাছাবাছি করে গোটা চারেক কাপড় বেঁধে নিল আর একটা ছেঁড়া শাড়ি জড়িয়ে। মাকড়ি খুলে রেখেছিল, দুকানেপরে

নিল। কোন অসুবিধা নেই। সেকেণ্ড মাস্টার বাইরে বেরোলেই তাল বুঝে পারুল বেরিয়ে আসবে। লম্বা ঘোমটা টেনে ঘুরপথ দিয়ে একেবারে তারাচরণের দরজায়। যদি আগলাবার কোন লোক আসে রোজকার মতন, তার চোখে ধুলো দিতে পারুলের এক মিনিটও লাগবে না।

সন্ধ্যা হতেই সেকেণ্ড মাস্টার উঠে পড়ল। তাকিয়া আর মাদুর ঘরের কোণে রেখে তৈরি হয়ে নিল। ফতুয়ার ওপর আধময়লা চাদর। ভোরের দিকে ফিরতে একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। হাতে মজবুত লাঠি। বলা যায় না, আগাছার ঝোপে ভরা মাঠের ওপর দিয়ে পাড়ি। সাপ-খোপের ভয়। হাতে একটা কিছু থাকা ভাল।

ঘর থেকে বেরিয়ে পারুল রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসেছিল। অবেলায় খাওয়া, রাত্রে উনান ধরাবার বালাই নেই। সেকেণ্ড মাস্টার বাইরে পা দিলেই, পারুল তৈরি হয়ে নেবে।

সেকেণ্ড মাস্টার চৌকাঠে পা দেবার সঙ্গেই বাতাসে চীৎকার ভেসে এল। একসঙ্গে অনেকগুলো লোকের। হঠাৎ পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠল। অশ্বত্থগাছের ঠাসবুনোন পাতার ফাঁকে লকলকে আগুণের শিখা। খুব দূরে নয়, বোধ হয় বাজারের কাছাকাছি কোথাও।

দরজা খুলেই সেকেণ্ড মাস্টার পিছিয়ে এল।—সর্বনাশ আগুন।

পারুল চোখ তুলে দেখল। ততক্ষণে আগুনের শিখা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ। ডাল ছেড়ে পাখীরা উৎকট চীৎকার শুরু করেছে। অনেকগুলো বাঁশ ফেটে যাওয়ার শব্দ।

আধময়লা চাদর উঠানে ফেলে সেকেণ্ড মাস্টার লাফিয়ে বাইরে চলে গেল। সামনের রাস্তায় লোকারণ্য। বালতি, গামলা যে যা পেয়েছে, তাই নিয়ে সবাই ছুটেছে। আধখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

পারুল শুনল। আগুন লেগেছে করিমের খড়ের গাদায়, কিন্তু চঞ্চলা তটিনীর মতন সেই আগুন স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে চলেছে। খড়ের গাদা থেকে দত্তদের চালে, সেখান থেকে নরহরি কামারের ভিটেয়। বাতাসে ভর দিয়ে কুসুমপুরের বুকে বৈশ্বানরের ছুটোছুটি খেলা শুরু।

হঠাৎ পারুলের চমক ভাঙল। অনেকেই মালপত্র মাথায়, বগলে নিয়ে ছুটে চলেছে। আগুনের আওতা থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। অশান্তি থেকে শান্তির স্নেহচ্ছায়ায়। পারুল আর একটুও দেরি করল না। ছুটে ঘরে ঢুকে কাপড়ের পোঁটলাটা বুকে করে নিল। সুনিপুণ হাতে টেনে দিল ঘোমটার বহর। দরজা ভেজিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

দরজার গোড়াতেই তারাচরণের সঙ্গে দেখা। কপাট খুলে আগুনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সারা মুখ আগ্নেয় আভায় উজ্জ্বল। পারুল একেবারে কাছে এসে দাঁড়াতে তারাচরণের হুঁস হল।

—একি তুমি? আমি ভাবলাম আগুনের ভয়ে কে বুঝি পালাচ্ছে।

—তাইতো। পোঁটলা নামিয়ে পারুল দম নিল। এতটা পথ একটানা দৌড়ে এসে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, বাইরের একরাতের আগুনটাই চোখে পড়ে মানুষের সারাজীবন ধিকি ধিকি আগুনে অস্থি মজ্জা সব পুড়ে যাচ্ছে তিল তিল করে, সেদিকে কারুর নজর নেই।

তারাচরণ হেসে পারুলকে নিজের কাছে টেনে নিল, কোথায় আগুন লাগল বলতো পারু?

পারুল আবার হাসল। আগুনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, কি জানি, বোধ হয় সেকেণ্ড মাস্টারের কপালে।

দুহাতের তালুতে তারাচরণ পারুলের মুখটা তুলে ধরল। পলকহীন

দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল তার দিকে। ব্যাপার কি পারুলের। সোজা কথার এমনি বাঁকা বাঁকা উত্তর দেবে সারাক্ষণ!

একটু আগে হয়তো এসে পড়েছি। কিন্তু চল এখনি বেরিয়ে পড়ি। এই গোলমালে লোকের চোখে পড়ার ভয় কম।

কথা শেষ করে পারুল কাপড়ের পুঁটলি আবার বুকে তুলে নিল। তারাচরণ এদিক ওদিক চেয়ে তক্তপোশের তলায় রাখা সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে নিল। পারুলের হাত ধরে টানতে গিয়েই থেমে গেল। গলায় আঁচল দিয়ে পারুল দুহাত জোড় করে আগুনকে প্রণাম করল। আরো লেলিহান হয়েছে শিখা, মানুষের কোলাহল আরো উদ্দাম।

বাঁধা শড়ক নয়, দুজনে মাঠে নামল। তিলকুশীর মাঠ ভেঙে, মধুবিলের পাশ দিয়ে ধানক্ষেত পার হয়ে সোজা স্টেশন। কতক্ষণেরই বা পথ। চলতে চলতে পারুল একবার পিছন ফিরে চাইল। কুসুম-পুরের গাছপালা ঝোপঝাড় রক্তিম পটভূমিতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর। চোখের সামনে থেকেই নয়, মনের সামনে থেকেও কুসুমপুর বুঝি মুছে গেল। খানাডোবা, মজাপুকুর, খোয়াওঠা কাঁকর সর্বস্ব পথ, নির্মম বাসিন্দা, সব কিছু নিঃশেষে উধাও।

কুসুমপুর নেই। সামনে কাঞ্চন নগর। নতুন মানুষের হাত ধরে নতুন সম্ভাবনায় উজ্জ্বল জীবনের ইশারা। পারুল চলার গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পৌছে পারুল সামনের বেঞ্চে বসে পড়ল। তারাচরণের পাশাপাশি। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে আবার দেখল। আগুনের প্রকোপ স্তিমিত। শিখার বদলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আর ভয় নেই। শান্ত হয়েছে কুসুমপুর।

কাঞ্চন নগর। না গ্রাম না শহর। চালের মিল, তেলের কল, টুকরো লোহার কারখানা যেমন আছে, তেমনি এসব ছাড়িয়ে নজরে পড়ে আকন্দ, বনতুলসী আর কাশ ফুলে ঢাকা এবড়ো খেবড়ো মাঠ, খোয়া ওঠা আঁকা বাঁকা শড়ক। গর্জন-মুখর লরীর সারের পাশা-পাশি শ্লথ গতি গরুর গাড়ীর দল।

রেলের কামরার জানালার ফাঁকে চোখ রেখে পারুল দেখল। মেয়ে কামরা। ভিড় কম। একেবারে ও পাশে জন চারেক আধ বুড়ী। মাঝখানে বুক পর্যন্ত ঘোমটা টানা একটি বৌ। হাবে ভাবে মনে হ'ল সদ্য বিবাহিতা। ফুলকাটা টিনের ট্রাঙ্ক, কাপড়ের পুঁটুলি, পাখা, কুঁজো, বেতের ঝুড়ি এধারে ওধারে।

একসঙ্গে এতখানি এসেছে, কিন্তু পারুল ইচ্ছা করেই আলাপ করে নি। কি দরকার, কি কথায় কি কথা এসে পড়বে। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপই বেরিয়ে আসবে। কোথায় চলেছে পারুল, সঙ্গে কে আছে, স্বামী কি কাজ করে, এইসব অবান্তর কথার স্রোত। পাড়া-গেঁয়ে মেয়েদের মুখে কিছু আটকায় না।

তাই প্রসারিত হাতের ওপর মাথাটা রেখে পারুল একেবারে এদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছে। সার সার টেলিগ্রাফের তার, কাঁটাঝোপ, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের ইশারা, মাঠে গরু ছেড়ে দেওয়া রাখালের উদাস দৃষ্টি, পুকুরে স্নান করতে নামা পল্লী বধুর সজল চোখ, এই সব দেখছে বসে বসে। ফাঁকে ফাঁকে নিজের বাড়ীর কথা মনে এসেছে।

কুসুমপুরের উঠান-সর্বস্ব বাড়ীর কথা নয়, বেলেঘাটার বাড়ী। বাপ, মা আর সার দিয়ে দাঁড়ান পড়শীদের মুখ।

কুসুমপুরে খোঁজা শেষ করে সেকেণ্ড মাস্টার হয় তো একেবারে বেলেঘাটায় গিয়ে উঠবে। স্ত্রীর সন্ধানে। পারুলকে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিক ওদিক অনেক তল্লাশ করেছে। ভাবিনীদির বাড়ী, চাঁদিনী সিনেমার ধারে কাছে। কিন্তু পারুল নিখোঁজ। অবশ্য বলা যায় না, বুদ্ধিমান লোক হলে দৌড়াদৌড়িই করবে না। কুসুমপুরের খবর বেলেঘাটায় পৌছোতে যাবে না। বৌ পালিয়েছে এমন একটা খবর পড়শীদের মুখরোচক হ'লেও, ছড়িয়ে বেড়াবার মতন প্রীতিপ্রদ মোটেই নয়। বেমালুম হয়ত চেপে যাবে সেকেণ্ড মাস্টার। উচ্চবাচ্য করবে না।

খোঁজ নিতে আসবেন পারুলের বাপ। এ বয়সে দৌড় ঝাঁপ আর পোষায় না। ছ মাসে একবার আসেন। গলদঘর্ম চেহারা আর হাঁপানীর টান দেখে ইদানীং পারুলই বারণ করত। কি দরকার এতটা পথ আসবার। ভালই আছে পারুল। খুব ভাল আছে। তেমন কিছু হ'লে, পারুলই জানাবে চিঠি লিখে। কিংবা চিঠি পত্রে খোঁজ খবর নিলেই চলবে।

কিন্তু তবু পারুলের বাপ আসেন মাঝে মাঝে। ন মাসে ছ মাসে। এসেই হয় তো থমকে দাঁড়াবেন। লাঠিতে ভর দিয়ে বসে পড়বেন। দরজায় তালা। পারুল বোধ হয় এদিক ওদিক কোথায় গেছে, এই ভেবে রাস্তার ওপারের মুড়ি বাতাসার দোকানে গিয়ে বসবেন। কোঁচার খুঁট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে অপেক্ষা করবেন।

বড় জোর আধ ঘণ্টা কিংবা ঘণ্টা খানেক। তার মধ্যেই সেকেণ্ড মাষ্টার ফিরে আসবে। তার পিছন পিছন পারুলের বাপ উঠানে এসে দাঁড়াবেন।

—পারুল ! খুব শান্ত গলায় বাবা ডাকবেন। প্রথমে রান্নাঘরের দিকে তারপর নজর ফেরাবেন দাওয়ার ওপর।

সেকেণ্ড মাস্টার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াবে। রক্ত রাঙা চোখ, কোঁচকান ভ্রু।

—পারুল আবার কে ? ও নামে কেউ নেই এখানে। যে ছিল সে নিজের হাতে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে চৌকাঠ পার হয়ে পথে বেরিয়েছে।

প্রথম প্রথম পারুলের বাপের বুঝতে অসুবিধা হবে। দাওয়ার ওপর বসে দম নেবেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন জামাইকে। এ আবার কি কথা। ঘরের বৌ পথে বেরোল কেন ?

কেন বেরোল, সে কথাই সেকেণ্ড মাস্টার চিবিয়ে চিবিয়ে বলবে। যতটুকু জানে ততটুকু। অবশ্য বাড়তি রং ফলিয়ে যে বলবে না কিছু, এমন নয়। রাতের অন্ধকারে বাড়ীর বৌ যখন ঘর ছাড়ে, তখন বাইরের কারো হাতছানি থাকে বৈকি। নাগরের ইশারা, ঝলমলে জীবনের সংকেত। তেমনই কিছু একটা হ'য়ে থাকবে।

সারা মুখ ঘৃণায় কুঁকড়ে আসবে পারুলের বাপের। তড়িৎ স্পৃষ্টের মতন থমকে উঠে দাঁড়াবেন। এমন একটা খবর কানে যাবার আগে শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে গেলেই ভাল হ'ত। বাইরে বেরিয়ে না গিয়ে পারুল উঠানের ওপর ওই ঝাঁকড়া গাছের ডালে শাড়ী আটকে ঝুলেও পড়তে পারত। মানুষজনকে একটা কৈফিয়ত দেওয়া যেত, মন গড়া কোন কাহিনী। কিন্তু এভাবে বংশে কলঙ্ক লেপে দেওয়ার কাজ কেন করল পারুল। নিজের মুখ তো পোড়ালই, চোদ্দপুরুষ নরকস্থ করল।

হাতের ছাতায় ভর দিয়ে পারুলের বাপ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবেন, মেয়ে আমার নেই বাবাজী, কোন

দিন ছিল না। অসুখে মরেছে এই কথাই আমি রটাব, তুমিও লোকজনকে তাই ব'ল।

সন্তর্পণে ছাতি ঠুকে ঠুকে পারুলের বাবা উঠান পার হ'য়ে যাবেন।

গালের ওপর গড়িয়ে আসা চোখের জল মুছতে গিয়েই পারুল বাধা পেল। জানালার ওপারে তারাচরণ এসে দাঁড়িয়েছে।

—নাও, নেমে পড়। এ স্টেশনে বেশীক্ষণ ট্রেণ থামবে না। কথার সঙ্গে সঙ্গে তারাচরণ এগিয়ে এসে দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল।

পারুল গায়ে মাথার কাপড় ঠিক করে সাবধানে নেমে দাঁড়াল প্লাটফর্মের ওপর। ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়া। দেহের ক্লান্তি লাঘব করে, কিন্তু মনের গ্লানি ঘোচাতে পারে না। ঘোমটা একটু টেনে পারুল তারাচরণের পিছন পিছন পা চালাল।

ঘোড়ার গাড়ী নয়, ট্যাক্সি। তারাচরণের পাশাপাশি বসে পারুল এদিক ওদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চল্‌ল। কারখানার পাশ দিয়ে, মিলিটারি ব্যারাকের গা ঘেঁসে দ্রুত গতিতে ছুট্‌ল ট্যাক্সি। লম্বা টিনের ঘর। সার সার। সামনে বাঁশের বেড়া। কাঠের দরজা। তারাচরণের ইঙ্গিতে দরজার সামনে ট্যাক্সি থামল। একপাল মুরগী এখানে ওখানে। পারুল নামতেই জানালার ফাঁকে ফাঁকে অনেক-গুলো মুখ দেখা গেল। রঙীণ শাড়ীর ইসারা। ফিস ফিসিয়ে কথা।

তারাচরণ ভাড়া মিটিয়ে কাঠের দরজায় হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আবলুস-কালো একটি লোক এক হাতের মুঠোয় পরনের লুঙ্গিটা চেপে ধরে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

—এই যে মাস্টার এসে পড়েছ? পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসি।

মাস্টার! মাস্টার আবার কে! সব ভুলে পারুল ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চোখ তুলে দেখল।

কদমছাঁট চুল, পানের রসে লালচে ঠোঁট, চোখের কোণ থেকে

গালের পাশ অবধি কাটা দাগ। হাসির সঙ্গে সঙ্গে মাংসের খাঁজের তলায় দুচোখ উধাও।

তারাচরণ হাসির উত্তরে মুচকি হাসল, তারপর মাণিক ঘর ঠিক আছে তো?

—তা আর বলতে মাস্টার। সাত নম্বর ঘর ধুয়ে মুছে ঝকঝকে ক'রে রেখেছি। বৌদিকে নিয়ে গৃহ-প্রবেশ কর।

কথা শেষ করে আবার পেঁচিয়ে হাসি। ঢেঁকুর তোলার ধরন।

তিনজনে এগিয়ে গেল। প্রথমে মাণিক, পিছনে তারাচরণ আর পারুল পাশাপাশি।

টিনের দরজা, সেই তুলনায় বেশ বড় সাইজের তালা। মজবুত গড়ন।

কিই বা জিনিষপত্র, কিন্তু ঘর গোছাতে পারুলের বেলা পড়ে এল। রান্নার বালাই নেই। হোটেল থেকে মাণিকচাঁদ সব নিয়ে আসবে। শুধু খাবারই নয়, তোলা উনুন, কয়লা, মাটির হাঁড়ি, সংসারের টুকি-টাকি অনেক কিছু।

ঘর গুছোতে গুছোতেই পারুল জিজ্ঞাসা করল, এ মাণিকটিকে জোগাড় করলে কোথা থেকে?

মেঝেয় চাটাই পেতে তারাচরণ দাড়ি কামাবার জোগাড় করছিল, মুখ তুলে হেসে বলল, গোবর চাপা ছিল, বহু কষ্টে উদ্ধার করেছি।

পারুল ভ্রু কোঁচকাল। কেবল হেঁয়ালী। সোজা কথার যদি একটা সোজা উত্তর দেবে। আরো কাছে সরে এসে পারুল আবার বলল, তোমাকে মাস্টার মাস্টার ব'লে ডাকে যে? তুমি আবার কিসের মাস্টার?

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই খুব জোরে তারাচরণ হেসে উঠল

টিনের ছাদ কাঁপিয়ে। হাসি থামলে বলল, বরাত তোমার। এক মাস্টারের হাত থেকে আর এক মাস্টারের হাতে এসে পড়লে। তবে উন্নতি হয়েছে, সেকেণ্ড মাস্টারের হাত থেকে একেবারে ফার্স্ট মাস্টারের হাতে, হেড মাস্টারও বলতে পার।

—কেবল মস্করা। ঠিক ক'রে একটা কথাও কি বলতে নেই? কপট রাগে আরক্ত হ'য়ে উঠল পারুলের দুটি গাল।

সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তারাচরণ উত্তর দিল, আরে ব্যস্ত কেন? হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার। আজ রাত্রেই সব মালুম হবে।

রাত্রে নয়, সন্ধ্যার মুখেই পারুল টের পেল।

এবার লুঙ্গি নয়, মাণিকচাঁদের পরণে ফর্সা ধুতি। ফর্সা ধুতি আর ধবধবে পাঞ্জাবী। হাতে বার্নিশ চকচকে কালো বাক্স।

নতুন কেনা ট্রাঙ্ক খুলে পারুল জামা-কাপড় গুছোচ্ছিল, দরজার আওয়াজ হ'তেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। টিনের ফাঁকে চোখ রেখে সব দেখল।

পাতা চাটাইয়ের ওপর মুখোমুখি বসল দুজনে। তারাচরণ আর মাণিকচাঁদ। কাঠের বাক্স খুলে মাণিকচাঁদ ক্ল্যারিওনেট বের করল। কিন্তু মাণিকচাঁদ বাজাল না, বাজাল তারাচরণ। দু গাল ফুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে অনেকক্ষণ ধরে বাজাল। করুণ সুর। গুমরে গুমরে কান্নার মতন। বুকের মাঝখানে অব্যক্ত এক বেদনা। জলে ভরে আসে দু চোখের কোণ।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পারুল শুনল। টিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে। মাণিকচাঁদ চলে যেতেই পারুল তারাচরণেব সামনে দাঁড়াল।

—কি, এখন বুঝলে তো, আমি কিসের মাস্টার? কুসুমপুরে যাবার আগে আমি অনেকদিন ছিলাম এখানে। মাণিক আমার সাগরেদ। কেমন লাগল বল?

এত কথার পারুল কোন উত্তর দিল না। ঝপ করে বসে পড়ল তারাচরণের পাশে। দু'হাতে তার একটা হাঁটু জড়িয়ে ধরে বলল, কথা দাও ও সর্বনেশে বাঁশী তুমি কোনদিন বাজাবে না; কখনও নয়?

তারাচরণ অবাক। এ আবার কি? গাল বেয়ে জলের ধারা। সুপুস্ট বুক দুটো ওঠানামা করছে উত্তেজনায়। থর থর করে কাঁপছে দুটো ঠোঁট।

তারাচরণ একটা হাত দিয়ে পারুলকে কাছে টেনে নিয়ে এল। পারুলেরই আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল। হেসে বলল, আরে এতে এত কান্নার কি হ'ল। ক্ল্যারিওনেট তো মানুষ হরদম বাজাচ্ছে।

বাজাক। কিন্তু তারাচরণকে পারুল বাজাতে দেবে না। পারুলের এক মামা। বাবরী চুল, ফিনফিনে পাঞ্জাবী, চওড়া পাড় ধুতি পরণে। পারুলের আবছা মনে আছে। প্রথম দিকে প্রায়ই আসত পারুলের বাড়ী। আর এলেই সবাই ঘিরে ধরত তাকে। বাঁশী শোনাতে হবে। কোন আপত্তি করলে চলবে না। অবশ্য আপত্তি ভদ্রলোক কোনদিনই করতেন না। কথার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁশী বের করে ফুঁ দিতেন। কখন মিহি, কখন গুরুগম্ভীর সুর। কিন্তু বেশ কিছুদিন আর তার সন্ধান পাওয়া গেল না। ও পথই মাড়ালেন না। পারুল অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে মাকে। মা চোখ মুছেছেন। তার নাকি খুব অসুখ। বিছানা থেকে ওঠবার শক্তি নেই।

আচমকা ভোর রাতে কান্নার শব্দে পারুলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। মার গলা। তারপর এক সময়ে সব শুনেছিল। মারা গিয়েছে মামা। মুখ দিয়ে কাঁচা রক্ত। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হয়নি। ডাক্তার বদ্যি সবাই হার মেনেছে। কিছুদিন পরে মার কাছেই পারুল শুনেছিল। ওই রাক্ষুসে বাঁশী বাজিয়েই নাকি এই রোগ

দাঁড়িয়েছিল। বুকের দোষ, পাঁজরা ফোঁপরা করে দিয়েছিল একেবারে।

মামার কথাই পারুল তারাচরণকে বলল। কান্নাজড়ানো গলায়, থেমে থেমে। তারাচরণ হেসে উঠল। সজোরে।

—আরে এই ব্যাপার। কোন ভয় নেই, আমি তো ন'মাসে ছমাসে বাঁশী ছুঁই। আমার কিছু হবে না।

মনে মনে পারুল প্রতিজ্ঞা করল, নমাস ছমাসও নয়, সাত জন্মেও বাঁশী মুখে ঠেকাতে দেবে না তারাচরণকে। মাণিকচাঁদ বরং অন্ত মাস্টার খুঁজে নিক বাঁশী শেখাবার।

ঘুমন্ত অবস্থায় তারাচরণের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যেও অনেকবার পারুল কেঁপে কেঁপে উঠল। উঠানে কার খড়মের আওয়াজ, কাশির শব্দ। বলা যায় না, খুঁজে খুঁজে এতদূর অবধি বুঝি ধাওয়া করল সেকেণ্ড মাস্টার। দরজা খুললেই চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে পারুলকে নিয়ে যাবে কুসুমপুরের চালাঘরে। দরজায় ডবল তালা লাগিয়ে বৌকে সারাজীবনের মত বন্দী করে রাখবে।

ভোরে উঠেই কথাটা পারুল তারাচরণকে বলল, এই শোন, যদি খোঁজ খবর করে এসে হাজির হয়?

তারাচরণ বুঝেও না বোঝার ভান করল, কে আসবে?

—কে আবার, ওর কথা বলছি। কুসুমপুর থেকে কাঞ্চন নগর তো এক রাতের পথ। এলেই হ'ল।

—আসা অবশ্য এমন কিছু বিচিত্র নয়। পয়সা ফেললেই রেলে উঠতে পারে, কিন্তু সারা কাঞ্চন নগর খুঁজে পাবে কি করে তোমাকে? তবে হ্যাঁ, তুমি যদি আস্তানা জানিয়ে চিঠি লেখ তো অন্য কথা।

—তাতো বলবেই, নেমকহারাম কোথাকার! খুলে পড়া খোঁপা

জড়াতে জড়াতে পারুল রাগে ফেটে পড়ল, বলে যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর।

তারাচরণ দাঁতন থামিয়ে হেসে উঠল, বারে, চুরি তুমি করলে? আমি চেষ্টাচরিত্র ক'রে ঘরের বৌ বের করে নিয়ে এলাম, আর বাহাদুরী তোমার?

পারুলের মনে তখন অন্য চিন্তা। পরিহাসের হালকা সুর কানেই লাগল না। —ধর যদি পুলিশে খবর দেয়?

—মাথা খারাপ। এতদিন সেকেণ্ড মাস্টারের সঙ্গে ঘর করেও মানুষ চিনলে না। বৌ গেলে বৌ হবে, কিন্তু ইজ্জৎ গেলে আর ইজ্জৎ হবে না। এসব নিয়ে কোর্টঘর করবে সে জাতের লোক সেকেণ্ড মাস্টার নয়। এ তুমি দেখে নিও।

পারুলেরও অবশ্য তাই মনে হ'য়েছিল। হৈ হল্লা নয়, চেঁচামেচি নয়, সেকেণ্ড মাস্টার গুম হয়ে যাবে। নীলকণ্ঠের বিষ। উগরানোরও উপায় নেই, গেলাও যাবে না। মিছামিছি পারুল ভয় পাচ্ছে! সে মানুষ কোনদিন এ বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াবে না।

দিন কুড়ি, তার মধ্যেই তারাচরণ চাকরি একটা জুটিয়ে নিল। মাণিকচাঁদ করিৎকর্মা লোক। খোঁজ খবর ক'রে ধানকলে শুধু চাকরির সন্ধানই নয়, ঢোকার হদিশও বাতলে দিল। আবদুল কাদের ফোরম্যান, তার হাতে কিছু ঠেকাতে পারলে সব ঠিক।

তারাচরণ কাদেরের হাতে কিছু ঠেকাল বটে কিন্তু খোয়া গেল পারুলের। সামান্য কয়েক ভরির সোনা চিক চিক হার। তারাচরণ হাত পেতে দাঁড়াতে তাই খুলে দিল গলা থেকে। চাকরি হ'লে তারাচরণ সুদে আসলে শোধ করে দেবে। হার তো ফিরে আসবেই তার সঙ্গে নতুন চুড়ি আর কানপাশা।

খুব ভোরে আবছা অন্ধকার থাকতেই তারাচরণ বেরিয়ে যেত। ধানকলের কাজ শুরু সাড়ে পাঁচটায়। বারটা নাগাদ খেতে ফিরতো। খাওয়া দাওয়া সেরে পান মুখে মাদুরের ওপর ঘণ্টা খানেক একটু গড়িয়ে নিয়ে আবার দৌড়ান। বাড়ি ফিরতে গোটা সাতেক।

কাজ বলতে পারুলের কিছুই নেই। ছোট দুটো ঘর, ঝাড়ামোছা করতে কতটুকু সময়ই বা লাগে। রান্নাবান্না সারতেও বেশী সময় নেয় না। তারপর অফুরন্ত অবসর। শুয়ে বসে দিন যেন আর কাটতে চায় না। ইচ্ছা করেই পড়শীদের সঙ্গে পারুল আলাপ জমায় নি। শেষকালে কথায় কথায় কি বেরিয়ে পড়বে মুখ থেকে ঠিক আছে! তারাচরণ আগেও থাকত এখানে, তার চেনা জানা লোক থাকলেই সর্বনাশ! খ্যাপলা জাল ফেলে মাছ তোলার মতন মনের সব কথা টেনে বের করে নেবে। তার চেয়ে চুপচাপ খিল এঁটে ঘরে বসে থাকাই ভাল।

কিন্তু তাতেও কি পার আছে। দুপুরের দিকে বন্ধ দরজায় ঘা পড়ল। এক সঙ্গে অনেকগুলো হাতের। একটু ইতস্তত করে পারুল খিল খুলেই সরে দাঁড়াল। একটি দুটি নয়, গুটি চারেক। ঘোমটা-টানা বৌ থেকে শুরু করে গাছকোমর-বাঁধা মেয়ে।

—আলাপ করতে এলাম ভাই। ওরই মধ্যে একজন বলল। মুচকি হেসে।

মানুষের ঘরে মানুষ এসেছে, তাড়িয়ে তো আর দেওয়া যায় না। পারুল মাদুর পেতে দিল। এসে বসলও কাছাকাছি।

—বিয়ে হয়েছে বেশীদিন নয়, তাই না? কাছে বসা বৌটি মুখ টিপে হাসল।

হঠাৎ এ কথা। পারুল দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। কিন্তু উত্তর দিতে হল না। বৌটিই উত্তর দিল, হাসি না থামিয়ে, আমি পাশেই থাকি কি না। টিনের দেয়ালের ওপাশেই। অনেক রাত অবধি ফিসফিসানি কানে আসে। ভয় নেই ভাই, কথা বুঝতে পারি না, ওই শুধু গুঞ্জনটুকুই।

সকলেই এক সঙ্গে হেসে উঠল। একজন ঢলে পড়ল আর একজনের গায়ে। পারুলের সিঁথির সিঁদুর সারা মুখে ছড়িয়ে গেল। নিচু হয়ে হাত দিয়ে মাদুরের কাঠি খুঁটতে লাগল।

অবশ্য শুধু পারুলের কথাই নয়, নিজেদের কথাও বলল। বেশীর ভাগ বাড়ির কর্তারা মিলে কাজ করে, কেউ ধানকলে, কেউ লোহার কারখানায়, কেউ কেউ আবার স্টেশনের ওপারে বরফের কলে। মস্ত সুবিধা পারুলের, এরা কেউ তারাচরণকে চেনে না, কারণ বেশীদিন এরাও আসেনি কাঞ্চন নগরে। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাও নয়। শ্যাওলার মতন ভেসে চলেছে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে। বাড়ির লোকের চাকরি বদলানর সঙ্গে সঙ্গে এদেরও আস্তানা বদল চলেছে।

কেবল খবর নেওয়াই নয়, মাঝে মাঝে দরকার হলে হাত পেতে জিনিস নিতেও দ্বিধা করল না। দুপুরের দিকে পাশের বাড়ীর বৌ এসে দাঁড়াল। রান্নাবান্না চুকিয়ে পারুল রান্নাঘর ধুচ্ছিল, চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, বড্ড মুশকিলে পড়েছি দিদি। কোথাও কিছু নেই, কারখানা থেকে, ফেরবার পথে ইয়া বড় এক মাছ এনে হাজির। মাসের শেষ, ভাঁড়ার খালি। একটু সরষের তেল ধার দিন দিদি, ও মাসের প্রথমেই দিয়ে যাব।

অবশ্য পারুলেরও মাসের শেষ, তবু দুজন লোকের সংসার, সব সময়ই বাড়তি কিছু থেকে যায়। পলা করে তেল তুলে দিতে

দিতে পারুল বলল, এ তেল আর তোমায় শোধ দিতে হবে না ভাই।

তেল অবশ্য শোধ দেয় না, কিন্তু পারুলের অন্য কাজ করে দেয়।

রাস্তার ওপাশে টেপাকল। ছুটির দিন তারাচরণই বালতি ক'রে জল বয়ে আনে। কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু অন্যদিন পারুল মুশকিলে পড়ে। রাস্তার ওপার থেকে বালতি বয়ে জল আনতে ভারি লজ্জা করে। পথচলতি লোকেরা হাঁ করে চেয়ে থাকে। তা ছাড়া বালতি কলের মুখে বসিয়ে হাতল ধরে ঝাঁকি দিতেও বড্ড বেকায়দায় পড়ে যায় পারুল। গায়ের মাথার কাপড় খসে যায়, আর টনটন করে দুটো হাত।

পাড়ার মেয়ে রাধা সে সমস্যার সমাধান করে দিল। রোজ সকাল বিকাল নিজে স্নান আর গা ধুয়ে আসার সময় দু বালতি করে জল এনে দেয় পারুলের জন্য।

—নাও গো দিদি, জল নাও। ঠক করে দাওয়ায় বালতি নামিয়ে রাধা চেঁচায়।

পারুল বালতি ঘরে তুলতে তুলতে এক গাল হাসে, বাঁচালে বাধা। ভগবানের কাছে কামনা করি লাল টুক-টুকে বর হোক। কোন দুঃখ না থাকে।

রাধাও ঠোঁটকাটা। ছাড়বার মেয়ে নয়। ভিজে চুল নিংড়োতে নিংড়োতে বলে, দোহাই তোমার দিদি, অমন বরে আমার দরকার নেই। কাচের আলমারিতে তুলে রাখতে হবে শেষকালে। তার চেয়ে আমার কালো জোয়ান বর হওয়াই ভাল। খেটে যাতে খাওয়াতে পারে।

আশ্চর্য মেয়ে রাধা। মা নেই, সব মিলিয়ে ছোট ছোট পোটা পাঁচেক ভাই বোন। বাপ ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। সমস্ত ঝামেলা রাধার

ঘাড়ে। এক হাতে রান্না-বান্না, ঝাঁট-পাট, ভাইবোনদের বায়না ঝক্কি সব সামলায়। এক তিল বসে না। চর্কির মতন ঘুরছে দিন রাত। জানলা দিয়ে পারুল সব দেখেছে। টেপাকলের জল নিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে সমানে ঝগড়া করছে হিন্দুস্থানী মিস্ত্রিদের সঙ্গে। লাথি মেরে তাদের হাড়িকলসী সরিয়ে দিয়েছে। একদিন স্নান করতে করতে চোখের সাবান মুছে দেখল এক ছোকরা কাছে দাঁড়িয়ে ফিক্-ফিক্ করে হাসছে। বুকের কাপড় ঠিক করে নিয়ে রাধা সজোরে তার গালে দুটো চড় দিয়েছিল। চড়ের আওয়াজ এত দূর থেকেও পারুলের কানে এসেছিল। পারুল ভেবেছিল, ছোকরাও বুঝি রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু একটি কথা নয়, টেলিগ্রাফের পোস্টে হেলান দেওয়া সাইকেল তুলে নিয়ে চোঁ-চা দৌড়। এক মিনিট থামে নি।

এ পাড়ায় রাধার নাম ডাকাতে রাধা। রাধার তাতে কোন আপত্তি নেই, সে স্পষ্টই বলে পারুলের কাছে, আমার ডাকাত না হয়ে উপায় কি বল দিদি। মিনমিনে হলে আর সংসার চালাতে পারতাম না। বারো ভূতে আমায় শেষ করে ফেলত। তারপর হঠাৎ গলা থামিয়ে পারুলের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেছে, ও মুখপোড়া তোমাদের বাড়ি এত ঘন ঘন আসে কেন বল তো?

—কোন মুখপোড়া? পারুল সত্যিই অবাক হয়।

—ওই যে মাণকে। দিন নেই, রাত নেই হুটহুট করে দেখি এ বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াচ্ছে।

মাণকে! মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পারুল হাসল। ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না, কেন বল তো? মাণিকচাঁদের ওপর মন পড়েছে নাকি? ভালবাসা হয়েছে?

—ঝাঁটা মারি অমন ভালবাসার মুখে। তার চেয়ে সাত জন্ম আইবুড়ো থাকব, সেও ভাল।

—তবে রাগটা কেন ?

—লোক দিদি মোটেই সুবিধার নয়। ওকে বেশী আস্কারা দিও না।

—আস্কারা আর কি। আগে রোজ আসত ওর কাছে বাঁশি শিখতে। এখন বাঁশি শেখা বন্ধ, তবে গল্পগুজব করতে আসে।

—ঘর ভাঙবার যম ! নিজের মনে রাধা গজ গজ করে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াবার ফাঁকে ফাঁকে।

—কার ঘর ভাঙল রে ? পারুল আলতা পরছিল হেঁট হয়ে, মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল।

—কে জানে কার ঘর ! বৌটা সারাটা দিন রাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত।

—কার বউ ? আলতা পরা থামিয়ে পারুল ঘুরে বসল।

আহা কচি বউ। বছর ষোল-সতেরোর বেশী নয়। ফুসলে ফাসলে বের করে এনেছে। স্বামীর অসুখ, তারকেশ্বরে হত্যা দেবার ছল করে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছিল।

—তারপর ?

—তারপর আর কি। পুলিসে বাড়ি ঘিরে ফেললে কোথা থেকে খবর পেয়ে। বৌকে স্বামীর কাছে নিয়ে গেল। মাণকেরও হাতে দড়ি দিয়ে নিয়ে গেল। অবাক কাণ্ড, দিন পনেরোর মধ্যে মাণকে ফিরে এল। অনেক টাকা ঢেলে বুঝি রেহাই পেয়েছে। সবাই বলে পুলিসের সঙ্গে নাকি খুব খাতির। কিন্তু পুলিস রেহাই দিলে কি হবে, ভগবান রেহাই দেন নি।

শিশির মুখে আঙুল টিপে পারুল আলতা ঢালছিল, রাধার কথায় চমকে উঠতেই শিশি কাত হয়ে পড়ল। আলতা নয় যেন তাজা রক্তের স্রোত।

—আহা হা পড়ে গেল দিদি, রাধা চেঁচিয়ে উঠতেই পারুল হাত নেড়ে বাধা দিল, ও আমি তুলে নিচ্ছি। ভগবান কি শাস্তি দিলে বলছিলে?

—হ্যাঁ, শাস্তি বই কি। ওই জন্যই তো মাণকে কোনদিন গায়ের জামা খোলে না। সারা বুকে পিঠে সাদা দাগ। দেখো সর্ব্বাঙ্গ ভরে যাবে। গলে খসে পড়বে। সধবা মেয়ের চোখের জল সহজ কথা!

রাধা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুটো হাত কোলে নিয়ে পারুল চুপচাপ বসে রইল। নতুন শাড়িতে আলতার ছোপ, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। মাণিকচাঁদ আর তারাচরণে খুব কি প্রভেদ! দুজনেই তো বাড়ীর বৌকে বের করে এনেছে। ভগবানের শাস্তি থেকে তারাচরণও বুঝি রেহাই পাবে না। সারা গা শ্বেতীতে ভরে যাবে।

এক সময়ে পারুল জোর করে উঠে দাঁড়াল। কি সব আবোল তাবোল ভাবছে বসে বসে। ছলছুতো করে মাণিকচাঁদ বাড়ির বৌকে ফুসলে এনেছে, তার শাপমন্যি কুড়িয়েছে। কিন্তু পারুল এসেছে স্বেচ্ছায় তারাচরণের হাত ধরে। সেকেণ্ড মাস্টারের সঙ্গে বাঁধা গাটছড়া নিজের হাতে খুলেছে। তারাচরণকে ভালবেসে পারুল ঘর ছেড়েছে।

তবু তারাচরণ বাড়ী ফিরতেই পারুল জানাল কথাটা। তারাচরণ মুখ বুজে সব শুনল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, কোথা থেকে এ কাহিনী জোগাড় করলে?

—রাধা বলেছে, ডাকাতে রাধা।

—এ রকম কি একটা ব্যাপার আমিও শুনেছিলাম, মাণিককেও জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু সে বললে, মেয়েটাকে স্বামী বুঝি নির্যাতন করত তাই সে ইচ্ছা করেই পথে বেরিয়েছিল, পথেই দেখা মাণিকের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বৌ পথে পথে ঘুরবে, তাই মাণিক নিজের বাড়িতে এনে তুলেছিল। আর তাছাড়া, তারাচরণ গলার স্বর আরো মোলায়েম

করল, আস্তে আস্তে বলল, এতো বোঝাই যাচ্ছে, গোলমেলে কিছু হলে পুলিস ছাড়ত মাণিককে? হাতে দড়ি দিত না?

তাই হবে। পারুল নিজের মনকে বোঝাল। নয়তো পুলিস অমনি হাতেনাতে ধরেও কখন ছেড়ে দেয় আসামীকে।

উত্তর দেবার আগেই দরজায় শব্দ। তারাচরণ দরজা খুলতেই মাণিকচাঁদ এসে ঢুকল।

—নমস্কার রাঙা বৌদি। কি এনেছি দেখুন। কথার সঙ্গে সঙ্গে মাণিকচাঁদ পকেট থেকে কাগজের মোড়ক বের করল।

আগে আগে মাণিকচাঁদের সামনে বের হত না পারুল। গলার আওয়াজ পেলেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকত, কিন্তু আজকাল তারাচরণের কথায় সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘাড় নেড়ে দু একটা কথার উত্তরও দেয়।

পারুল কথা বলল না, জিজ্ঞাসা করল তারাচরণ, কি ব্যাপার? কি আনলে বৌদির জন্য?

মাণিকচাঁদ কোন উত্তর না দিয়ে কাগজের মোড়ক খুলে ফেলল। দামী কিছু নয়, আট গাছা চুড়ি, তাও কাচের। তা হোক, ভারি পছন্দসই জিনিস। ঘোমটা ফাঁক করে পারুল চেয়ে চেয়ে দেখল। কচি কলাপাতা রং, ওপরে সোনালী ফুটকি।

—নাও গো, মাণিক এনেছে, হাতে করে তুলে নাও। তারাচরণ চুড়ির গোছা এগিয়ে দিল পারুলের দিকে।

একটু ইতস্তত ভাব, দ্বিধা আর সংকোচের মিশেল। তারপর নিচু হয়ে পারুল কাগজের মোড়কটা তুলে নিল।

—চুড়িগুলো পরে আসুন রাঙা বৌদি, দেখে নয়ন সার্থক করি। মাণিকচাঁদ টেনে টেনে হাসল। অসমান দাঁতের সার বের করে।

পারুল চুড়িগুলো পরল বটে কিন্তু বাইরে এল না। পাশের ঘরে চুপচাপ বসে রইল। কান খাড়া করে।

কিন্তু একটা কথাও কানে এল না। তারাচরণ ফিসফিসিয়ে কথা বলল আর মাণিকচাঁদ শুধু ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল। মুখে টুঁ শব্দ নয়।

মাণিকচাঁদ চলে যেতেই পারুল ঘরে ঢুকল, বাব্বা, কি এত গোপন কথা। দুজনে গুজগুজ ফুসফুস।

—ওঃ, আড়ি পেতেছিলে বুঝি?

—বয়ে গেছে আড়ি পাততে। পাশের ঘরে বসে ছিলাম, অথচ একটি কথা কানে গেল না, অন্য দিন তো চীৎকারে কান পাতা দায়।

—সর্বনাশ, হিংসা হচ্ছে না কি? তারাচরণের দু চোখে বিস্ময়ের ছিটে। তোমাকে ফিসফিসিয়ে যে সব কথা বলি কানে কানে, সে সব কিন্তু বলি নি।

—ন্যাকামি করো না। পারুলের চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, বলতে না চাও, অন্য কথা।

—পাগল হ'লে, তারাচরণ হেসে ফেলল, তোমাকে বলতে চাই না, এমন কথা আবার আছে না কি? ওসব কলকারখানার চাকরিবাকরির ব্যাপার। ওসব তুমি বুঝবে না। ধানকলের এ চাকরি আর পোষাচ্ছে না। রোজগার না বাড়ালে তোমাকে সুখে রাখব কি ক'রে।

তারাচরণের কথায় পারুল একেবারে গলে গেল। এগিয়ে এসে মাথাটা রাখল তার কোলের ওপরে। তারাচরণের একটা হাত নিজের বুকের ওপর এনে আদুরে গলায় বলল,—আহা, সুখ বুঝি কেবল পয়সায়। রোজগার তো তোমাদের সেকেণ্ড মাস্টারও করত। তার ঘর ছেড়েছি বুঝি বেশী পয়সার মুখ দেখব বলে?

তারাচরণ আর কথা বাড়াল না। নিবিড় আলিঙ্গনে পারুলকে কাছে টেনে নিল।

সেদিন দুপুরের দিকেই তারাচরণ বাড়ি ফিরে এল। খেয়ে দেয়ে

জানলায় দাঁড়িয়ে পারুল চুল শুকোচ্ছিল, মুখ তুলেই দেখল সামনের রাস্তা ধরে হনহন করে এগিয়ে আসছে তারাচরণ।

কি ব্যাপার, শরীর খারাপ, নাকি কোন দুঃসংবাদই এল কোথা থেকে। কিছু বলা যায় না। ঘর-পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায় পারুল। সেকেণ্ড মাস্টারই এল খবর নিতে, না পুলিসই এল গন্ধ শুঁকে শুঁকে। তাই বুঝি সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসছে তারাচরণ।

তারাচরণ উঠানে পা দেবার আগেই পারুল দরজা খুলে দাঁড়াল।

—কিগো শরীর খারাপ নাকি? পারুলের গলায় উদ্বেগের সুর।

—শরীর খারাপ শত্তুরের হোক। তারাচরণ লাফিয়ে দাওয়ার ওপর উঠল।

—থামো, থামো আর বড়াই কর না। তবু যদি না সেদিন ভুগে উঠতে।

—ভাগ্যে অসুখ করেছিল, না হলে তোমার সেবা পেতাম কি ক'রে।

পারুল কথা ঘুরিয়ে নিল, ঠিক দুপুরবেলা চলে এলে যে? মালিকরা তাড়িয়ে দিলে নাকি?

তারাচরণ হাসল। ঘরের মধ্যে ঢুকে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, দুটো সিনেমার টিকেট যোগাড় করেছি। ম্যাটিনি শো। তাই ছুটি নিয়ে চলে এলাম। নাও কাপড়-চোপড় পরে নাও। এ তো আর চাঁদিনী সিনেমা নয় যে হুট করে চলে আসবে। 'কোহিনুর' এখান থেকে পাক্কা আড়াই মাইল। সকাল সকাল রওনা হতে হবে।

সাজ গোজ সারতে পারুলের বেশ একটু সময় নিল। প্রসাধন দ্রব্যের অভাব নেই। আশ মিটিয়ে পারুল সব কিনেছে। দু রকম পাউডার, বিলিতী স্নো, রুজ, পমেড। নখরঞ্জনী এমন কি চ্যাপ্টা বোতলে

অগুরু পর্যন্ত। দেয়ালের গায়ে টাঙানো কোনাভাঙা আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পারুল অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখল। ছোট্ট আয়না। শুধু আবক্ষ প্রতিমূর্তি। সারা শরীর নজরে আসে না। অবস্থা ফিরলে তারাচরণকে বলে বড় একটা আয়না কিনবে। ড্রেসিং-টেবিল হলে তো কথাই নেই। কিন্তু তেমন অবস্থা হতে এখনও অনেক দেরি।

আয়নার দিকে চেয়ে পারুল বিরক্তিতে মুখ কোঁচকাল।

মেঝেয় বসে তারাচরণ পাম্পশু বুরুশ করছিল, হেসে বলল, কি হল?

—দূর, এত ছোট আয়না। নিজেকে ভাল করে দেখাই যায় না। তারাচরণ হেসে উঠল, আরে এত বড় একটা আয়না থাকতে ওসব ছোটখাটো আয়নার দিকে নজর দিতে যাওই বা কেন?

—কোথায় আবার বড় আয়না?

ফিরেই পারুল অপ্রস্তুত। একটা হাত নিজের বুকে রেখে তারাচরণ মুচকি হাসছে।

একটু এগিয়েই সাইকেল-রিক্সা পাওয়া গেল। দুজনে শুধু পাশাপাশিই বসল না, ঘেঁষাঘেঁষিও। সামনের ঝাঁপ ফেলে দিতেই তারাচরণ একটা হাত দিয়ে পারুলকে আরো কাছে টেনে আনল।

—দিনদুপুরে কি অসভ্যতা হচ্ছে? পারুল কপট বিরক্তিতে আঁকা ভ্রূ বাঁকা করল।

—ম্যাটিনি শো যে গো। তারাচরণ ঘন হয়ে বসল। পারুলের মাথাটা নিজের বুকে রেখে।

'চাঁদিনী' সিনেমার চেয়ে ঢের বড় 'কোহিনুর'। জমজমাট হল। সামনে ঝোলানো লাল ভেলভেটের পর্দার দামই কত! গদিআঁটা চেয়ার। হেলান দিলে মনে হয় যেন তারাচরণের হাতের ওপর হেলান দিয়েছে। ম্যাটিনি শো কিন্তু একটি চেয়ারও খালি নেই।

হল ভাল হলে হবে কি, ছবি পারুলের খুব ভাল লাগল না। হিন্দী বই, কথায় কথায় গান আর নাচ। আর কি বিশ্রী সব পোষাক। পুরুষ মানুষের পাশে বসে ছবি দেখতেই লজ্জা করে। সে পুরুষমানুষ কাছের মানুষ হলেও।

সিনেমা শেষ হ'তে পারুলই বলল, দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, চল হাঁটতে হাঁটতে যাই।

তারাচরণের আপত্তি নেই। ভিড় কাটিয়ে এগোতে এগোতে বলল, পারবে তো এতটা পথ হাঁটতে?

চোখের ভঙ্গী করে পারুল বলল, না পারলে তুমি তো রয়েছই পাশে। কোলে তুলে নিও।

দিন তিনেক আগে সিনেমা যাবার জন্য সেই যে তারাচরণ সিল্কের পাঞ্জাবী বের করেছিল, সেটা আর খোলে নি। কদিনে ধরে সেটা গায়ে দিয়েই কারখানায় যাওয়া আসা করছে।

মাণিকচাঁদ বারণ করেছিল, মাস্টার ওসব শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পোষাক, ও পরে কারখানায় না যাওয়াই ভাল। চারদিকে মেশিন ঘুরছে, কখন কিসে আটকে যাবে ঢিলে পাঞ্জাবী, তখন বিপদ।

কথাটা কানে যেতেই পারুল শিউরে উঠেছিল, সত্যি বাপু, তোমার আর পাঞ্জাবী পরে কাজে গিয়ে দরকার নেই। কি হতে কি হবে শেষকালে।

তারাচরণ পাঞ্জাবী গায়ে চড়াতে চড়াতে হেসেছিল, পাগল নাকি, মেশিনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি শুধু চালের হিসাব করি ধানকলের গেটের কাছে বসে। কত চাল লরীতে উঠল আর কত মণ ধান নামল ব্যস এই পর্যন্ত। যন্ত্রপাতির কাছে ঘেঁসি না। ভয় নেই।

তারাচরণের এ আশ্বাসের পরেও কিন্তু পারুলের চিন্তা গেল না। মানুষের নিয়তির কথা কিছু বলা যায় না। বাইরে বসে কাজ হলে হবে কি, মানুষের ডাকে ভিতরে গেলেই হল। বড় বড় চাকা ঘুরছে চারদিকে, একটু আটকে গেলেই আর দেখতে হবে না, গোটা মানুষটাকে টেনে নেবে কাছে। তারপর! তারপর আর ভাবতেও পারুলের মাথা ঝিমঝিম করে উঠে। আগামী দিনের কল্পিত সর্বনাশের কালো ছায়া দুলতে থাকে চোখের সামনে।

চোখ মুছে মুখ তুলে চাইতেই পারুলের নজরে পড়ল। একেবারে ও কোণে আধময়লা সার্ট একটা ঝোলানো। বোধ হয় ধোবার অপেক্ষায়। আঙুল গুনে গুনে পারুল হিসাব করল। ধোবা আসতে এখনও দিন পাঁচেক। তার চেয়ে এর মধ্যে সাবান দিয়ে সার্টটা কেচে রাখাই ভাল। কাল সকালে তারাচরণ কাজে বেরোবার সময় পাঞ্জাবী সরিয়ে সার্টটা এগিয়ে দেবে। সাবধানের মার নেই।

কোন অসুবিধা নেই। বাড়িতে ভাল কাপড়-কাচা সাবান রয়েছে। রাধার কল্যাণে দু বালতি জলও মজুদ। পরনের শাড়িটা আঁটসাঁট করে নিয়ে পারুল ঠিক হ'য়ে নিল। চনচনে রোদ। সার্ট শুকোতে বেশী সময় নেবে না।

কাচবার আগে সার্টের পকেটগুলো পারুল একবার হাতড়ে হাতড়ে দেখে নিল। যা ভুলো মন তারাচরণের। মাসের মধ্যে দশদিন ধানকলে ঢোকবার 'অ্যাডমিট কার্ড' বাড়িতে ফেলে যায়। যে কোন তাকে কিছু কিছু পয়সা পাওয়া যায়। কুড়িয়ে বাড়িয়ে পারুল কৌটোয় জমা করে রাখে।

ওপরের পকেটে হাত দিয়েই পারুল মুচকি হাসল। আচ্ছা, অসাবধান লোক। এবার আর খুচরো পয়সা নয়, এক টাকার একটা নোটই মোড়া রয়েছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজ বের করেই পারুল

অবাক। নোট নয়, ভাঁজকরা কাগজ। খুলতেই বোঝা গেল চিঠি একটা। মেয়েলী হাতে আঁকা-বাঁকা লেখা। কারুর হাত দিয়ে এসেছে চিঠিটা। তলায় গোল গোল অক্ষরে লেখা, 'তোমার শ্রীমতী গোলাপবালা দাসী'।

সামনের সব কিছু ঝাপসা ঠেকল। চাপ-চাপ অন্ধকার। এত কাঁপছে আঙুলগুলো যে চিঠিটা ধরে রাখাই দায়। মেঝেয় চিঠিটা রেখে পারুল তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

চিঠিটা যে তারাচরণের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কয়েক লাইন পড়েই সেটা বোঝা গেল। গোলাপবালা মামার মারফৎ চিঠিটা কুসুমপুর পাঠিয়েছিল, চাঁদিনী সিনেমার ঠিকানায়। সেখান থেকে তারাচরণ নিখোঁজ। তার পরের খবর এনেছে সম্পর্কে গোলাপবালারই এক মামা। ধানকলের বয়লার দেখে দেখে বেড়ানো তার কাজ। কাঞ্চননগরের 'বিশ্বনাথ রাইস মিল'এ তারাচরণের খোঁজ পেয়েছিল। এগিয়ে আলাপ করতে গিয়েছিল, কিন্তু তারাচরণ আমল দেয় নি। পাশ কাটিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু মতলবটা কি তারাচরণের? বিয়ে-করা বৌয়ের কথা না হয় মনেই পড়ে না কিন্তু পাঁচু আর পুঁটির কথাও কি একবার মনে পড়ে না! বাবা বাবা! বলে তারা কেঁদে খুন। তারাচরণ কি পাষাণ! কি ভাবে যে গোলাপবালার দিন কাটছে তা লিখে জানাবার নয়। পরের বাড়ি ধান ভেনে, মুড়ি ভেজে দু বেলা দু মুঠো খোরাকের জোগাড় হ'চ্ছে। ভাসুর ভাজ মুখ ফিরিয়েও দেখেন না। পত্রপাঠ তারাচরণ একটা বন্দোবস্ত করুক। ধানকলে চাকরি করছে, এখন তো অনায়াসেই তারাচরণ বৌ ছেলেমেয়েকে শহরে নিয়ে যেতে পারে।

পারুল অনেকবার চিঠিটা পড়ল। খেয়াল হল চোখের জলে চিঠির অক্ষরগুলো ঝাপসা হ'য়ে যাবার পর। একি হ'ল। পারুলের

সুখের সংসারে অমঙ্গলের কালো ছায়া। শঙ্খচূড়ের বিষাক্ত নিশ্বাসে নিমেষে সব পুড়ে ছাই। ঢলঢলে পাঞ্জাবীর জন্যই ভয় ছিল পারুলের, কিন্তু কে জানত হাতকাটা সার্টের মধ্যে এমন সর্বনাশের বীজ লুকানো ছিল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে পারুল চুপচাপ বসে রইল।

বিকালের ঝোঁকে তারাচরণ ফিরে আসবে। ছলনার মুখোস পরে, হাসি টেনে মুখের ভাঁজে ভাঁজে। ইনিয়ে বিনিয়ে ভালবাসার কথা বলবে। বলা যায় না, হয়তো হাতে করে পারুলের জন্য কোন জিনিসই নিয়ে আসবে। রংদার ব্লাউজের ছিট কিংবা মন-মাতানো আতরের শিশি, মিনে-করা আংটি হওয়াও আশ্চর্য নয়।

কিন্তু হাত পেতে নিতে পারবে না পারুল। তার আগেই হাত পেতে রয়েছে গোলাপবালা দাসী আর তার অর্ধভুক্ত ছেলেমেয়ে। তাদের বঞ্চনা ক'রে কেমন ক'রে পারুল জিনিস নেবে? কোন লজ্জায়। শুধু কি জিনিস, মানুষটার গায়েও তো তাদের ছায়া। তাদের স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ কেমন করে পারুল মুছে নেবে। কেমন করে ছেঁড়া তারে পুরানো দিনের ঝঙ্কার তুলবে।

আবার নতুন করে পারুল কাঁদতে শুরু করল।

এক সময়ে পারুল উঠে দাঁড়াল। আঁচল দিয়ে চোখও মুছল। মানুষটা বিকালে বাড়ী ফিরবে। রান্নাবান্না আছে, চা-জল খাবার, এমন ক'রে পড়ে পড়ে কাঁদলে কি হবে।

আর তা ছাড়া, কথাটা পারুলের হঠাৎ-ই মনে পড়ল। তারাচরণের যেমন বৌ আছে, ছেলেপিলে আছে, তেমনি তারও তো ছিল স্বামী আর সাজানো সংসার। সে যেমন সেকেণ্ড মাস্টারকে

ভুলতে পেরেছে, সরে এসেছে তার আওতা থেকে, তেমনি তারাচরণও সব পিছনে ফেলে পারুলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। পত্নী প্রেমই শুধু মুছে ফেলেনি, অপত্য স্নেহও মুছেছে নির্মম হাতে।

রান্নাবান্না সবই পারুল করল, কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে চোখও মুছল বার কয়েক। পোড়া চোখ কেবলই জলে ভরে আসে।

তারাচরণ ফিরল একটু রাতে। পারুল দরজা খুলে দাওয়ার কাছেই বসেছিল, তারাচরণকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

পারুল কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই নিজে কৈফিয়ৎ দিল,—আর বল কেন, এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে দেরি হ'য়ে গেল। তাদের পাড়ায় জলসার আসর, টেনে নিয়ে গেল সেখানে।

রাত এমন কিছু বেশী হয়নি। বড় জোর আটটা। অন্যদিন হলে এমন একটা ব্যাপারকে পারুল আমলই দিত না। কৃত্রিম অভিমানের ভাণ করত কিংবা গানের আসরে তাকে না নিয়ে যাওয়ার জন্য একটু চেঁচামেচি।

আজ কিন্তু সেসব কিছুই করল না। কিছু আশ্চর্য নয়, গানের আসর টাসর হয় তো বাজে কথা। গোলাপবালার লোকই হয় তো এসেছিল খোঁজ ক'রে ক'রে। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অনুনয়। ছেলে-মেয়ের দোহাই। হাজার হোক অগ্নি সাক্ষী রেখে বিয়ে করা বৌ। সাতপাকের বাঁধন পরকীয়া প্রেমের পল্‌কা সুতোর বাঁধনের চেয়েও অনেক শক্ত।

কথা বলল না পারুল। আলনা থেকে গামছা পেড়ে তারাচরণের হাতে দিল। বালতি এগিয়ে দিল তার দিকে।

তারাচরণ অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল, তারপর বলল,—কি ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি ?

—না, শরীর খারাপ হবে কেন। পারুল রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল।

—গলাটা যেন ভার ভার লাগছে।

—ঠাণ্ডা লেগেছে একটু।

পারুলের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে তারাচরণ সরে এল পারুলের কাছাকাছি, বলল,—দেখি জ্বর-টর হয়নি তো।

পারুল চৌকাঠ পার হ'য়ে রান্নাঘরে ঢুকল।—না, না, জ্বর-টর আমার সাত জন্মে হয় না।

কিন্তু তারাচরণ ছাড়ল না। কাছে এসে পারুলের গালে, কপালে হাত দিয়ে দেখল।

—হ্যা, গা-তো বেশ গরম ঠেকছে।

আঁচল দিয়ে পারুল মুখ ঢাকল। সজোরে মাথা নাড়ল।

—উহুঁ, মোটেই গা গরম নয়। নাও, মুখ হাত ধুয়ে এস, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

—তোমার কি হয়েছে আগে বল, নয় তো আমি হাত মুখও ধোব না, জলও স্পর্শ করব না।

কথা শেষ করে তারাচরণ চৌকাঠ চেপে বসল।

—বল্লাম তো তোমায়, কিছু হয়নি। অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই মুখ চোখ একটু ফুলেছে।

চেয়ে চেয়ে তারাচরণ কিছুক্ষণ দেখল, তারপর গামছা কাঁধে নিয়ে মুখহাত ধুতে কলঘরে ঢুকল।

অন্যদিন দুজনে একসঙ্গে চা খায়। পাশাপাশি বসে। আজ কিন্তু তারাচরণের চায়ের কাপ পারুল মাদুরের সামনে রাখল।

গা হাত পা মুছে তারাচরণ বাইরের ঘরে ঢুকেই অবাক।—কি ব্যাপার? তোমার চা?

—শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। চা'টা না খাওয়াই ভাল।

পারুলের কথা শেষ হবার আগেই তারাচরণ হেসে উঠল সজোরে। টিনের ছাদ কেঁপে উঠল সে হাসিতে।

—আরে শরীর ম্যাজ ম্যাজ করলেই তো চা খায়। সিনেমায় চায়ের বিজ্ঞাপন দেখনি। নাও, নাও, তোমার চা নিয়ে এস। আর তোমার চা না ক'রে থাক তো কাপ নিয়ে এস একটা। ভাগ করে খাই।

পারুল আর কথা বাড়াল না। বাড়িয়ে লাভও নেই। কোন কথা তারাচরণ কাণে তুলবে না, কোন ওজর আপত্তি মানবে না।

রান্নাঘর থেকে চা ভর্তি কাপ নিয়ে এসে পারুল তারাচরণের কাছে বসল।

চায়ে চুমুক দিয়ে তারাচরণ হাসল।

—কি হয়েছে সত্যি কথা বলতো? টেপাকলে জল তুলতে গিয়ে কারুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি? না, তোমার তো বাহন রাধা রয়েছে, সেই জল এনে দেয়। তবে মেজাজ খারাপ হ'ল কিসে?

পারুল কোন উত্তর দিল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তারাচরণকে, আপাদমস্তক। সত্যি কথাটা যদি পারুল ব'লেই ফেলে, সহ্য করতে পারবে তারাচরণ? উঠে গিয়ে নিজের ট্রাঙ্ক থেকে যদি দোমড়ান, তেলের ছোপলাগা, বিবর্ণ চিঠিটা সামনে ফেলে দেয়, সাপ দেখার মতন চমকে উঠবে না তারাচরণ? মুহূর্তে মুখের রং কাগজ-সাদা হ'য়ে যাবে, ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি! অথৈ জলে ডোবা মানুষের মতন হাত বাড়িয়ে কেবল আশ্রয়ের মাটি খুঁজবে।

কিন্তু তারপর। পারুলের সাধের এ তাসের ঘরও তো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মানুষটা যদি সরে যায় রাতের অন্ধকারে! গোলাপবালা আর ছেলেমেয়েদের আকর্ষণে ফিরে যায় নিজের ফেলে

আসা গৃহস্থালীর মাঝখানে, পারুলের কি দশা হবে? দু'গালে কালি তো মেখেইছে, সারা গায়ে এবার পথের ধূলো মাখবে।

অনেক ভেবে পারুল আসল কথাটা চেপেই গেল। শতছিন্ন বিছানার ওপর ভদ্রতার চাদর পাতা রয়েছে, এই তো বেশ, সেটুকু সরে গেলে নগ্নরূপ প্রকট হয়ে পড়বে, দারিদ্র্য-জর্জর অবস্থা।

—কি মুস্কিল, পারুল মিহি ক'রল গলার স্বর—বলছি তো কিছু হয়নি। কেবল দুপুর বেলা হঠাৎ বাবাকে স্বপ্ন দেখলাম। খুব রোগা আর বুড়ো হ'য়ে গেছেন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে পারুল কেঁদে উঠল। কাঁদবার এমন একটা সুযোগই সে খুঁজছিল।

তারাচরণ চুপচাপ। এতদিন পরে বাপকে মনে পড়ল পারুলের!

মুখে কিছু বলল না বটে তারাচরণ, কিন্তু এগিয়ে একটা হাত রাখল পারুলের পিঠের ওপর।

—ছেলেমানুষের মতন স্বপ্ন দেখে কাঁদতে শুরু করলে, আচ্ছা মেয়ে তো তুমি?

পারুল কোন উত্তর দিল না। বাপের কথাটা আচমকা বেরিয়ে গিয়েছে মুখ থেকে। শরীর খারাপ হওয়ার মিথ্যা অজুহাতে কিছু একটা বলতে গিয়ে। তারাচরণ আবার কি মনে করল কে জানে। আজ বাপকে স্বপ্ন দেখেছে পারুল, বলা যায় না কাল হয়তো সেকেণ্ড মাস্টারকে দেখবে। মানুষটার জন্য মন কাঁদা মানেই তো ফেলে আসা সংসারের জন্য বুক টনটন, কিন্তু তাই যদি হয়, কেবল বুক টনটনই করবে পারুলের, পিছু হেঁটে কুসুমপুরে ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। স্বামী ছেড়ে আসা মানে সামাজিক অনুশাসনও দুপায়ে দলে আসা।

এমন মানুষ নয় সেকেণ্ড মাস্টার যে অনুশোচনায় চোখের জল ফেললেই, চোখ মুছিয়ে ঘরে তুলবে। তা ছাড়া এসব প্রশ্নই ওঠে না।

না খেয়ে পথের ধুলোয় পারুল রাত কাটাবে কিন্তু তবু সেকেণ্ড হ্যান্ড-নিদ্রার ঘরে আর ফিরে যাবে না। ফিরেই যদি যাবে তো ঘর ছেড়ে আ-. কোন দুঃখে। নিজেকে বোঝাল পারুল কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইল। নড়তে গেলেই প্রাণান্তকর যন্ত্রণা।

পাশাপাশি শুয়ে এক সময়ে পারুল কথাটা বলেই ফেলল, আচ্ছা এত বয়স অবধি বিয়ে করনি কেন?

উত্তরটাও পারুল আশা করেছিল। আবেগভরা গলায় হয়তো তারাচরণ বলবে, তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। না পেলে সারাটা জীবন অপেক্ষা করতাম।

সিনেমায় হরদম এমনি ধরনের কথা। নায়ক নায়িকাকে বলছে কিংবা নায়িকা নায়ককে।

তারাচরণ কিন্তু এমন কথার ধার দিয়েও গেল না। মুখের জলন্ত সিগারেটটা মেঝেয় টিপে নিভিয়ে দিয়ে বলল, করিনি তোমায় কে বলল?

বিছানার ওপর পারুল উঠে বসল। সত্যি কথা বলেছে তারাচরণ। এমন একটা সত্যি কথা বলার সাহস তাহলে তার রয়েছে, বিশেষ ক'রে পারুলের সামনে। কিন্তু কাঁটাটা আবার খচ খচ ক'রে উঠল। এ সত্যি কথাটা তারাচরণ না বললেও তো পারত। এর চেয়ে বানিয়ে বানিয়ে একটা মিথ্যা বললেই হ'ত। যে কোন একটা সাজানো কথা।

—তাহলে তারা সব কোথায়?

আবার পারুল ভুল করল। দোমড়ানো চিঠিটা জল জল করে উঠল চোখের সামনে। গোলাপবালা আর তার ছেলেমেয়েরা সার দিয়ে দাঁড়াল।

—তারা আবার কে?

আসা তোমার বৌ আর ছেলেপুলেরা ?

তো —হুঁ, তারাচরণ চাপা নিশ্বাস ফেলল, ঘরই করলাম কবে যে ছেলেপুলে হবে।

পারুল কিছু বলবার আগে তারাচরণ বলল, বিয়ের ছ'মাস পরেই তো দেহ রাখল সতী-লক্ষ্মী।

কথার শেষ দিকে তারাচরণ একটু পরিহাসের মিশেল দেবার চেষ্টা করল। শ্লেষোক্তি।

—মারা গেল ? পারুলের দু' চোখে বিদ্যুৎ।

—তাইত শুনলাম শালাদের চিঠিতে। তিন দিনের জ্বরেই খতম।

—কি নাম ছিল তোমার বৌয়ের ? পারুল একটু সরে ব'সল তারাচরণের কাছ থেকে। জলজ্যান্ত মানুষকে যমের বাড়ী পাঠায় এমন পুরুষের বেশী কাছে না থাকাই ভাল। বেমালুম আউড়ে যাচ্ছে মিথ্যা কথাগুলো।

—গোলাপবালা। নিশ্চিন্ত গলায় তারাচরণ উত্তর দিল, ডাকনাম আন্নাকালী। বাপের অস্টম সন্তান কিনা, সবাই হাঁপিয়ে উঠেছিল। আর যাতে না হয়, তাই এমন একটা নাম রাখা।

সেই মুহূর্তে পারুলের ইচ্ছা করল উঠে দাঁড়াবে বিছানা থেকে, সোজা বাইরের দরজা খুলে পথে পা দেবে। চলে যাবে যেদিকে দুচোখ যায়।

সেকেণ্ড মাস্টারের সংসার ছেড়েছিল তার রূপ আর রুচি পছন্দ হয়নি বলে, আজ তারাচরণের ঘর ছাড়বে তার মনের এই বিকৃত পরিচয় পেয়ে।

অবশ্য পারুল এসব কিছুই করল না। পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুঁজল। কিন্তু ওই চোখই বুঁজল, একফোঁটা ঘুম এল না চোখে।

এপাশ ওপাশ করতে করতে কানে এল তারাচরণের নিশ্চিন্ত-নিদ্রার শব্দ। অকাতরে ঘুমচ্ছে মানুষটা লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে।

দিন তিন চার কাটল। আস্তে আস্তে ঘা শুকিয়ে এল। ব্যথাও কমে গেল অনেকটা।

তারাচরণ কারখানায় বেরিয়ে যাবার পর একদিন ট্রাঙ্ক খুলে পারুল চিঠিটা বের করল। রান্নাঘরের তাক থেকে দেশলাই পেড়ে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল। নীল শিখা, পারুলের ঈর্ষার মতনই। আস্তে অস্তে সমস্ত কাগজটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। খুব যত্ন করে পারুল ছাইগুলো কুড়িয়ে নিল। ও ছাই যেন গোলাপবালার চিতা-ভস্ম। তার স্মৃতির সমাধি।

অনেকটা নিশ্চিন্ত। নড়তে চড়তে চিঠিটা চোখে পড়ত। চিঠি তো নয়, ছেলেপুলে নিয়ে গোলাপবালাই যেন বসেছিল এক কোণে।

মন ঠিক ক'রে নিল পারুল, কিন্তু তারাচরণ যেন একটু আনমনা। রোজ বিকালে মাণিকচাঁদ আসে। দুজনে ফিসফাস। অনেকক্ষণ ধরে। কিসের শলা-পরামর্শ।

মুখ ফুটে পারুল জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেলল, রোজ এত ফুসফাস কিসের?

—আর বল কেন? তারাচরণ কপাল কোঁচকাল, কারখানায় নাকি ধর্মঘট শুরু হবে। হৈ-চৈ মারপিট ক'দিন চলবে কে জানে!

—তাই নাকি, মুখ শুকিয়ে গেল পারুলের, কেন হ'চ্ছে ধর্মঘট?

—ওই মাইনে বাড়ানো আর মাগ্‌গীভাতা নিয়ে। মালিকরা একটি পয়সা ছাড়বে না, এরাও আদায় করে ছাড়বে।

—এক কাজ কর না তার চেয়ে, অনেক ভেবে চিন্তে পারুল উপায় বের করল, ছুটি নাও না কিছুদিনের। গোলমাল চুকলে তবে কারখানায় যাবে।

তারাচরণ হাসল।

—এখন ছুটি নিলে একেবারে ছুটি দিয়ে দেবে। যাক্, শোন, আসতে দেরী হ'লে ভেবনা। ছুটির পরে প্রায়ই মিটিং বসছে এখন। সেখানে না গেলে আবার মুস্কিল। হাজার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

আরো দিন দুয়েক কাটল। সেদিন তারাচরণ সকাল সকাল কাজে বেরোল।

মানুষটা কাজে বেরিয়ে গেলে অখণ্ড অবসর। শুয়ে বসে পারুলের সময় আর কাটে না। দুপুরের দিকে কড়া নাড়ার শব্দে পারুল উঠে বসল।

—কে?

—আমি দিদি। রাধার গলা।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল পারুল। অনেকদিন রাধা আসেনি।

—কিগো, তুমি আর যে মাড়াওই না এ পথ! পারুল অনুযোগ করল।

ছোট ভাইটার বসন্ত হয়েছিল, এই দু'দিন উঠে বসেছে। বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেরোতে পারিনি এক পা। তারপর তোমার খবর কি বল?

—আমার আর কি খবর, রাধার হাত ধরে পারুল মাদুরের ওপর বসাল। ওই চলছে এক রকম। তবে মনের অবস্থা সুবিধে নয়।

—কেন ঝগড়া হয়েছে বুঝি কর্তার সঙ্গে?

উঁহু সে সব কিছু নয়। ওর কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়েছে। কি আবার গোলমাল হবে, কে জানে।

—ধর্মঘট! রাধা ঠোঁট কামড়াল। ওর বাপ ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। আশ পাশের সব কারখানাতেই ছুটকো ছাটকা কাজ থাকে। কাজেই সব জায়গার খবরই রাধা কিছু কিছু রাখে।

—ধর্মঘট তো মিটে গেছে।

—মিটে গেছে? কে বল্লে, না, না, পারুল ঘাড় নাড়ল, এখনও শুরুই হয়নি ধর্মঘট। বোধ হয় দিন দশেকের মধ্যে আরম্ভ হবে।

—উঁহু, রাধা জোর দিল গলায়, বিশ্বনাথ রাইস মিল তো? মজুর আর বাবুরা ক্ষেপে উঠেছিল বটে, কিন্তু সে তো মালিকরা সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। পূজোর সময় বুঝি বাড়তি টাকা দেবে বলেছে।

আশ্চর্য লোক তো তারাচরণ! এমন একটা ব্যাপারেও কি সত্যি কথা বলতে নেই। মিছিমিছি মানুষকে ভয় দেখানো। নাকি আর কোন মতলবে ফিরছে তারাচরণ। পারুলকে যা তা একটা বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছে। আজ বিকালে বাড়ী ফিরলে পারুল স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করবে।

এদিক ওদিক কথাবার্তার পর রাধা উঠে পড়ল। দু'দণ্ড বসবার সময় নেই বেচারীর। গোটা সংসার তার মাথার ওপর।

—আমি এতদিন এলাম, তুমি কিন্তু সেই কবে একবার গেছলে দিদি।

—যাব ভাই, এইবার একদিন ঘুরে আসব।

রাধা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত খোলা দরজার সামনে পারুল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এলোমেলো হাওয়ায় ধুলোর ঘুর্ণি। একরাশ শুকনো পাতা ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে।

পারুলও তো অনেকটা ওই শুকনো পাতারই সামিল। হাওয়ার বেগে উড়ে চলেছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

একটু পরেই তারাচরণ ফিরে এল। হন্তদন্ত হয়ে। আয়নার সামনে বসে পারুল চুল আঁচড়াচ্ছিল, দরজায় ঘা পড়ল।

ফাঁক দিয়ে পারুল একবার দেখে নিল। এমন সময়ে ফিরে এল মানুষটা। কি ব্যাপার!

কি ব্যাপার, তারাচরণ নিজের মুখেই বলল। দিন কয়েকের জন্য একটু বাইরে যেতে হচ্ছে। অফিসের কাজে। ভয়ের কিছু নেই। তেমন দরকার পড়লে, মাণিকচাঁদকে জানালেই হবে।

ছোট চামড়ার হাতবাক্স। তারই মধ্যে জামাকাপড় আর নিজের কিছু জিনিষ তারাচরণ ভর্তি ক'রে নিল। যাবার সময় একটু আদরও করল পারুলকে। বড় জোর দিন পাঁচেক। অন্য একটা চালের কলে যাবে ধানের হিসাব মেলাতে। এখান থেকে সোজা বাস। ঘণ্টা ছয় সাতের পথ। কাজ হয়ে গেলেই ফিরে আসবে। একটুও দেরি করবে না।

যা বোঝাল তাই বুঝল পারুল। কিন্তু কোথায় একটা খটকা লেগে রইল। এক কারখানার লোক আর এক কারখানায় ধানের হিসাব নিতে যায় বুঝি! কিন্তু দিন কয়েকের মামলা বৈ তো নয়। তারাচরণ ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলেই হবে। ধর্মঘটের কথাটা ওভাবে বলার কি দরকার ছিল। দুদিন বাইরে থাকার প্রয়োজন যদি হয়েছিল, কথাটা সোজাসুজি বললেই হ'ত পারুলকে।

যতক্ষণ তারাচরণকে দেখা যায় পারুল চেয়ে চেয়ে দেখল। দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে দাওয়ার ওপর এসে দাঁড়াল। বাঁক ঘুরতে তারাচরণকে আর দেখা গেল না।

তারপরই পারুল ফিরে এসে বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ল। ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। বেশী জোরে কাঁদতে সাহস হ'ল না পারুলের। পাতলা টিনের পার্টিশন। এদিকের শব্দ ওদিকে গেলেই সবাই এসে দরজায় ভিড় করবে। হাজার প্রশ্ন। বাঁকা বাঁকা কথা। টিটকারীও দেবে দু'একজন। ঘরের মানুষ দু'দিনের জন্যে বাইরে গেলে বুঝি এমন মড়াকান্না কাঁদতে হয়। সবই ঢং। লোক দেখানো। পারুল বালিশের ওপর মুখটা চেপে ধরল।

ভাত তরকারী পড়েই রইল, পারুল ছুঁলও না কিছু। যেমন শুয়ে ছিল, তেমনি শুয়ে রইল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আচমকা ঘুম ভাঙ্গল কড়া নাড়ার আওয়াজে। কতক্ষণ ধরে কড়ার শব্দ হচ্ছিল খেয়াল নেই পারুলের। কিন্তু কড়া নাড়ার কায়দায় মনে হ'ল লোকটা অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

ধড়মড় করে পারুল উঠে পড়ল। ঘুমচোখে প্রথমে ঠাওর করতে পারল না। হাতড়ে হাতড়ে দরজাটা আন্দাজ করল। বাইরে অন্ধকার। ফুটোতে চোখ রেখে কিছু বুঝতে পারল না।

তারাচরণ ফিরে এল নাকি মাঝপথ থেকে? বাইরে থাকবার বুঝি আর দরকারই হবে না। মনে মনে পারুল একবার ঠাকুরকে স্মরণ করল। তাই যেন হয় ঠাকুর। তারাচরণকে ছেড়ে এভাবে এতদিন পারুল একলা থাকতে পারবে না।

—কে, কে? পারুল চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

—আমি রাঙা বৌদি, আমি। জড়ানো গলার আওয়াজ।

গলার আওয়াজে পারুল মানুষটাকে ঠাওর করতে পারল না।

গলার স্বর আর একটু চড়াল পারুল।

—কে আপনি? কাকে চান?

—রাঙা বৌদি, আমি মাণিকচাঁদ। দরজাটা একটু খুলুন।

আর দেরী করল না পারুল। দরজা খুলে দিল। মাঝরাতে মাণিকচাঁদ কেন? তারাচরণের বিপদ আপদ কিছু হ'ল নাকি। নয়তো তারাচরণ যে বাড়ী নেই সে কথা মাণিকচাঁদ নিশ্চয়ই জানে।

দরজা খুলেই পারুল একপাশে সরে দাঁড়াল ঘোমটা টেনে, গায়ে মাথায় কাপড় ঠিক ক'রে।

—উনি নেই এখানে, মিলের কাজে দিন কয়েকের জন্য বাইরে গেছেন।

খোলা দরজা দিয়ে মাণিকচাঁদ সোজা ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। পা দিয়ে পাতা বিছানাটা অনুভব করে নিয়ে তার ওপর চেপে বসল।

—হুঁ, মিলের কাজেই গেছে বটে। লাল পাগড়ীর ঠেলায় মাস্টার দেশান্তরী হয়েছে।

লাল পাগড়ীর ঠেলায়! মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে কি আবোল তাবোল বকছে মাণিকচাঁদ! এর মধ্যে পুলিসের কি হাঙ্গামায় আবার তারাচরণ জড়িয়ে পড়ল!

তবে কি, কথাটা আচমকা পারুলের মনে এল। সেকেণ্ড মাস্টার বুঝি খবর দিয়েছে পুলিসে, বউ চুরির অভিযোগ! তাই ঘরবাড়ী ছেড়ে নিখোঁজ হ'ল তারাচরণ।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। লাল পাগড়ী আসার কি হ'ল। থেমে থেমে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল পারুল।

হেঁ, হেঁ হেঁ, বলে মাণিকচাঁদ পেঁচিয়ে হাসল। বাতাসে কেমন একটা গন্ধ। এমন একটা সন্দেহ মাণিকচাঁদকে দেখেই পারুলের হয়েছিল। প্রকৃতিস্থ নেই মাণিকচাঁদ।

হাসি থামতে মাণিকচাঁদ পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিল।—মাস্টারের বড় অন্যায়। ভালবাসার লোককে সব কথা জানান উচিত ছিল। আজ ক'দিন ধ'রে এমন একটা ব্যাপার যে ঘটবে তার আঁচ পেয়েছি। বাবা, মাণিকচাঁদের দশটা চোখ। সব দিকে নজর।

এতক্ষণ পারুল দাঁড়িয়েছিল, এবার বসে পড়ল মেঝের ওপর। কাতর গলায় বলল,—দোহাই আপনার, কি হয়েছে ভেঙ্গে বলুন।

ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার আলো

কিছুটা মেঝেয় এসে পড়েছে। মাণিকচাঁদ চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ দেখবার চেষ্টা করল পারুলকে। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। বসার ভঙ্গীর মধ্যে অসহায়তার ছাপ।

—তা হলে শুনুন রাঙা বৌদি। আপনার সঙ্গে আলাপ হবার আগে মাস্টার 'চাঁদিনী' সিনেমার দেখাশোনা করত তো। জিনিষপত্র টাকা পয়সা সব তার জিম্মায়। তারপর আপনার সঙ্গে পালাবার কিছু আগে থেকে বৌয়ের অসুখ বলে মাস্টার ছুটির দরখাস্ত করল। পালাবার সময় চেঁছে মুছে ক্যাশবাক্স পরিস্কার ক'রে মাস্টার রাঙাবৌদির হাত ধ'রে কুসুমপুর ছাড়ল। এতদিন মালিকদের খেয়াল হয়নি। ভেবেছিল ছুটি ফুরোতে মাস্টার কাজে জয়েন করবে, তখন টাকা পয়সার হিসাব দেবে, কিন্তু মাসের পর মাস কাটল, মাস্টার আর আসে না। তখন টনক নড়ল। ক্যাশবাক্স খুলে দেখে একেবারে ঝকঝকে তকতকে। ফুটো পয়সাটি পর্যন্ত নেই।

একটু থামল মাণিকচাঁদ। কথাবার্তা জড়িয়ে আসছে। কথা বলতেও তার বেশ কষ্ট হচ্ছে। শুনতেও কম কষ্ট হচ্ছে না পারুলের। বুকের মধ্যে কামারের হাপরের দাপাদাপি। অসহ্য জ্বালা দুটি চোখে। একটু শুতে পারলে যেন বেঁচে যেত পারুল। অসীম ক্লান্তি ঘোচাতে অনন্ত সুষুপ্তি।

—কবে ফিরবে? মনে হ'ল পারুল যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে। শ্রান্তি-জড়ানো স্বর।

—তাকি বলা যায়। হাঙ্গামা না কমলে ফিরে আসা ঠিক হবে না। টানা হেঁচড়া করবে পুলিসে। আমি তো বর্ধমান পর্যন্ত গিয়েছিলাম, মাস্টারকে বড় রেলে চড়িয়ে দিয়ে এলাম। একেবারে পশ্চিমের দিকে পাড়ি। বড় বড় শহরে নয়, ছোট দেহাতে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল।

বিড়বিড় করে পারুল বলল,—আমি!

কথাটা লুফে নিল মাণিকচাঁদ, আপনার বন্দোবস্ত করতেই তো আসা। রাইস মিলে পুলিস কাল মাস্টারকে না পেলেই এখানে এসে হানা দেবে। জিনিষপত্র তচনচ করবে। আপনাকে রেহাই দেবে না। তাই মাস্টার ব'লে গেছে রাতারাতি জিনিষপত্রশুদ্ধ আপনাকে সরিয়ে ফেলতে। পুলিস এসে দেখবে, খাঁচা খালি, পাখি উধাও।

নিজের রসিকতায় বিনিয়ে বিনিয়ে মাণিকচাঁদ অনেকক্ষণ ধরে হাসল। তারপর হঠাৎ থেমে বলল, নিন রাঙা বৌদি গোছগাছ করে নিন। ভোরেই হয় তো এসে ব্যাটারা ঝামেলা বাঁধাবে।

গোছগাছ আর কি। বিছানাটা মাণিকচাঁদই গুটিয়ে দিল। রান্নাঘরে ঢুকে পারুল বাসন-কোশনগুলো জড়ো করল এক জায়গায়। তাক থেকে স্নো, পাউডার, আলতা, সিঁদুর নামিয়ে রাখল। ক'মাসের একটু একটু ক'রে গোছান সংসার পারুল অগোছাল করল।

সব বাধাছাঁদা শেষ করতে আধঘণ্টাও লাগল না। মাণিকচাঁদ উঠে দাঁড়াল, একটু অপেক্ষা করতে হবে রাঙা বৌদি। এত রাতে ঠেলা পাওয়া মুস্কিল। একটু আলো ফুটলে চেষ্টা করা যাবে।

পারুল কোন কথা বলল না। গোটানো বিছানার ওপর ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। বড় ক্লান্ত মনে হ'চ্ছে নিজেকে। এ ক্লান্তি দেহের নয়, মনের। চেয়ে চেয়ে পারুল এদিক ওদিক দেখল। বিরাট শূন্যতা, এ শূন্যতা বুঝি ওর হৃদয়ের নিঃস্বতারই প্রতীক।

এক সময়ে আলো ফুটল। দূরের অস্পষ্ট গাছপালা স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। মানুষের কোলাহল নেই, শুধু পাখিদের কলরব। মাণিকচাঁদ উঠে দাঁড়াল, একটা ঠেলার চেষ্টা দেখি রাঙা বৌদি। আপনি মুখ হাত ধোবেন তো ধুয়ে নিন।

পারুল চুপচাপ বসে রইল। সাড়া নয়, শব্দ নয়, ।
মূর্তির মতন।

ঠেলাগাড়ী দরজায় এসে দাঁড়াল। মাণিকচাঁদ বাক্স প্যাঁটরা ঠেলা ওপর তুলল। বাসন-কোশনের পুঁটলি। ঘুরে ঘুরে সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। তারাচরণের সংসার-যাত্রার কোন পরিচয় না পড়ে থাকে, যার সূত্র ধরে এগোতে পারে পুলিসের লোক।

যাত্রা সুরু হ'ল। প্রথমে ঠেলাগাড়ি, পিছন পিছন মাণিকচাঁদ আর পারুল। জনমানবহীন পথ। তখনও মিট মিট ক'রে রাস্তায় বাতি জলছে। মাণিকচাঁদের আস্তানা বেশী দূরে নয়, পারুল তারাচরণের কাছে সেটুকু শুনেছিল। কিন্তু ঠিক কোথায় তা জানা ছিল না। বাড়ীতে কে কে আছে, তাও জানা নেই। রাধার কাছে কিছু কিছু শুনেছিল মাণিকচাঁদের সম্বন্ধে। যেটুকু শুনেছিল তাতে কারো পক্ষে তার ডেরায় থাকা সম্ভব নয়। অন্ততঃ পারুল পারবে না। কিন্তু উপায়! কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে পারুল, কার আশ্রয়ে। দুরন্ত নদীর মতন কেবল বুঝি কূল ভেঙে ভেঙেই চলবে।

হঠাৎ পারুল থমকে দাঁড়াল। ঠেলাওয়ালাকেও থামতে বলল। ফিরেও চাইল না মাণিকচাঁদের দিকে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল।

বার দুয়েক। তারপরই ঝনাৎ করে দরজা খুলে গেল। আলু থালু অবস্থায় রাধা এসে দাঁড়াল। আঁচল দিয়ে চোখদুটো মুছে নিল প্রথমে, তবু যেন বিশ্বাস হল না। হাত দিয়ে স্পর্শ করল পারুলকে।

—দিদি তুমি? তারপরই চোখ পড়ল বাইরের দিকে। ঠেলা ভর্তি জিনিষপত্র। ঠেলার চাকায় হেলান দিয়ে হতভম্ব মাণিকচাঁদ।

—এসব জিনিষপত্র কার?

—আমার। খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট গলায় পারুল বলল। রাধা

বিড়বিড় ক' করার আগেই পারুল তার হাত ধরে একপাশে কথা দিল। দাওয়ার এক কোণে। থেমে, থেমে সব বলল। আসলের মনের কথাটাও পারুল বলল। একটু কষ্ট হবে রাধার, কিন্তু পারুলের বাঁচবার পক্ষে এ ছাড়া আর উপায় নেই। নিজের খরচ পারুল নিজেই চালাবে। দরকার হলে সাহায্যও করবে রাধার সংসারে। পয়সাকড়ি দিয়ে, গতরে খেটে।

—ঠিক আছে দিদি। এ কথা তুমি না বললে আমিই বলতাম। ও হতভাগার ঘরে গিয়ে তোমায় আমি কিছুতেই উঠতে দিতাম না।

রাধা দাওয়া থেকে নেমে এল। পিছন পিছন পারুলও। ঠেলাওয়ালাকে জিনিষ নামাবার কথা বলতেই মাণিকচাঁদ এগিয়ে এল।

—তার মানে, জিনিষ এখানে নামাবে কোথায় ?

—হ্যা, এইখানেই নামাবে। দিদি আমাদের বাড়ী থাকবে। তোমার বাড়ীতে একটি মেয়েছেলে নেই, সেখানে কোথায় উঠতে যাবে।

—কিন্তু মাস্টারকে কি বলব আমি। মাণিকচাঁদ ভোঁতা গলায় বলল। রাধার দিকে নয়, পারুলের দিকে ফিরে।

—মাস্টার যদি ফেরে, যা বলবার আমিই বলব। আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। রাধা খনখনে স্বরে উত্তর দিল।

মাণিকচাদ আর দাঁড়াল না। এদিকে ওদিকে চেয়ে হেঁটে হেঁটে রাস্তার ওপর গিয়ে উঠল।

দেড়খানি কুঠুরি। একটায় ভাই বোন নিয়ে রাধা, অন্যটায় বুড়ো বাপ শুত এতদিন, এবার পারুল আশ্রয় নিল। বাইরে দাওয়ার কোণে শোবার ব্যবস্থা করল। এমন কিছু অসুবিধা নেই। শুধু একটা চট টাঙালেই ঝড় বাদলের প্রকোপ থেকে নিস্কৃতি।

তারাচরণ যে ফিরবে না, এটা পারুল বুঝতে পেরেছিল। পুলিসের হাত এড়াতে এদিক ওদিক করে বেড়াবে। দরকার হলে গাঁয়ের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারে গোলাপবালার কাছে। দুচার দিন লুকিয়ে চুরিয়ে থাকা। কিন্তু পারুলের কাছে আর ফিরে আসবে না। ওখানে টাকা চুরির সমন ঝুলছে মাথার ওপর, এখানে ধরা পড়লে বৌ চুরির মামলাও শুরু হ'য়ে যাবে। নিস্তার পাবার কোন উপায় নেই। পারুল হাজার সাহায্য করলেও। ওরই মধ্যে কথাটা রাধাও বলেছে দুচার দিন। সব কথা শোনার পর আঁচল দিয়ে পারুলের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে কাছে বসে উপদেশ দিয়েছে, একটা চিঠিই লিখে দেখ না দিদি। মানুষের যেমন ভুল হয়, তেমনি ক্ষমাও তো আছে। সব কথা তুমি খুলে লিখে দেখ, আমি বলছি একটা উপায় হবে।

কোন উত্তর দেয়না পারুল। চুপচাপ বসে থাকে মাথা হেঁট করে। এরা কেউ চেনে না সেকেণ্ড মাস্টারকে। তার কাছে ক্ষমা নেই। দোষ করেছে শাস্তি ভোগ করতে হবে, এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই। সংশোধন নয়, বর্জন। দূষিত অঙ্গকে নিরাময় করার দিকে কোন লক্ষ্য নেই, শাণিত অস্ত্রোপচারে আমূল ছেদন। চিঠি তো দূরের কথা, তার পা জড়িয়ে ধরলেও কোন সুরাহা হবে না।

পারুল এগিয়ে গিয়ে সংসারের কাজ করতে যেতেই রাধা বাধা দিয়েছে। কোন দরকার নেই। লোহার শরীর রাধার। এত অল্পে টোল খাবে না। তার চেয়ে পারুল বরং ছেলেপুলে-গুলোকে আগলাক। একসঙ্গে হলেই মারামারি আর চেঁচামেচি। রাধার প্রাণ যাবার দাখিল।

পারুল সেই কাজই নিল। সবগুলোকে একসঙ্গে জড়ো ক'রে গল্প বলা, খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো। সব হয়, কিন্তু পারুলের মন ভরে না। পরগাছার মতন ঝুলছে আর একজনের সংসারে। মাটির আশ্রয় নয়' শূন্যে ঝুলছে শিকড়ের রাশ। একটু দমকা হাওয়া এলেই আবার ছিটকে গিয়ে পড়বে পথের ওপর।

রাধার বাপ যন্ত্রের বাক্স হাতে সকালে বেরিয়ে যায়, দুপুরে ফেরে আধ ঘণ্টার জন্য। খাওয়া দাওয়া সেরেই আবার বাইরে। এবার ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। ছুটির দিনও লোক আসে টুকিটাকি কাজের জন্য। বাতি ফিউজ কিংবা বাড়তি পয়েন্টের দরকার। রাধার বাপের আলস্য নেই। বাক্স হাতে অমনি পথে পা।

রাধার বাপের সঙ্গে পারুলের কথাই হয় না। পারুলই এড়িয়ে যায়, তাছাড়া দরকারও হয় না। পারুলের মনে হয়, বাইরের একজন সংসারে এসে ঢোকাতে, খুব খুশী নয় রাধার বাবা। কেবল রাধার ভয়ে মুখ বুজে চুপচাপ।

ওরই মধ্যে রাধার বাপ একদিন গোটা দুই ছোকরাকে ধরে নিয়ে এল। তেল চকচক টেরী, গায়ে বাহারী জামা, পানের রসে লাল টুকটুক ঠোঁট।

পাত্র আর পাত্রের বন্ধু। যদি পছন্দ হয়তো সামনের মাসেই বিয়ে। পারুল যত্ন করে রাধাকে সাজাল। শুধু নিজের স্নো পাউডারই নয়, দু একখানা গয়নাও পরিয়ে দিল তাকে। কপালে কাঁচপোকার

টিপ রাধা নিজেই পরেছিল, সেটা খুলে পারুল কুমকুমের টিপ এঁকে দিল। পায়ে আলতার রেখা, লিপষ্টিকের কল্যাণে রঙীন ঠোঁট।

মেয়ে পছন্দ হ'ল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। পাত্রপক্ষ থেকে মেয়েকে কোন প্রশ্নই করা হ'ল না। পরে খবর দেব বলে তারা উঠে গেল।

রাধার বাপও ছাড়বার পাত্র নয়। মেয়ের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। প্রত্যেক সপ্তাহে এক একজনকে ধরে আনতে লাগল। বয়স তো ক্রমেই বাড়ছে মেয়ের। এই বেলা একটা বন্দোবস্ত না করতে পারলে, এরপর বিয়ে দেওয়াই কঠিন হ'য়ে উঠবে। ওরই মধ্যে একজনের বোধ হয় একটু পছন্দই হ'য়ে গেল। কোন কারখানার ফিটার। আগে থেকেই জানা শোনা ছিল রাধার বাপের সঙ্গে। অ্যালবার্ট টেরী, দু'গালে ব্রণের ছিটে। নাক মুখ মন্দ নয়। আড়াল থেকে পারুল দেখেছে। দেখে যাওয়ার দিন দুয়েক পরেই রাধার বাপের নামে পোষ্টকার্ড। শ্রীচরণেষু দিয়ে শুরু, মাঝখানে মেয়ে পছন্দ হবার খবর, শেষে বিনীত শ্রীফটিক মণ্ডল।

দেনাপাওনার গোলমাল ছিল না, সামান্য দাবী, কাজেই বিয়ের কথাবার্তা পাকা হ'তে দেরী হ'ল না।

পারুল ঠাট্টা করল, দেখলে রাধা আমি কি পয়মন্ত মেয়ে। নিজের সংসার গোছাতে পারলাম না, ভাগ্যও ফেরাতে পারলাম না নিজের, কিন্তু এখানে এসে উঠতেই তোমার বিয়ের ফুল ফুটল।

রাধা মুচকি হাসল ভালই হ'ল। বাবার এক মেয়ে যেমন শ্বশুরবাড়ী যাবে, তেমনি দেখবার শোনবার জন্য আর এক মেয়ে ভগবান মিলিয়ে দিলেন।

বিয়ের আর দিন তিনেক বাকি। গরীবের সংসারে আর যোগাড়

যন্ত্র কিসের, তবু ওরই মধ্যে কেনাকাটা শুরু হয়েছে। টাকা পয়সার বন্দোবস্ত।

বেড়ার খুঁটিতে পারুল শাড়ী জামা শুকোতে দিয়েছিল। রাধা রান্নায় ব্যস্ত। সন্ধ্যা হ'য়ে আসতে পারুলই নেমে গেল মাঠের ওপর। কাপড় জামাগুলো তুলে আনবে।

কাপড়গুলো তুলতে তুলতেই নজরে পড়ে গেল। বুড়ো ভিখারী টেলিগ্রাফ-পোষ্টে হেলান দিয়ে গুপীযন্ত্র বাজাচ্ছে। তাকে ঘিরে লোকও জমেছে গোটা কয়েক। একটু পরেই গান শুরু করল। দেহতত্ত্বের গান। চমৎকার গলা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। গান থামতেই বুড়ো মাটির একটা সরা প্রসারিত করল। পয়সার প্রত্যাশায় সঙ্গে সঙ্গে ভিড় পাতলা। একজন ছজন ক'রে সবাই সরে গেল।

বিমর্ষ মুখে এদিক ওদিক চেয়ে লোকটা উঠে দাড়াল।

—এই শোন। বেড়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে দাঁড়াল।

লোকটা এদিকে মুখ ফেরাল।

—একটু দাঁড়াও, আমি এনে দিচ্ছি পয়সা।

বাকি কাপড়গুলো তুলে নিয়ে পারুল বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। জোর পায়ে। তাকের ওপর একটা দোয়ানি পড়ে আছে সেটা এনে এর হাতে দেবে।

দরজার কাছ বরাবর গিয়েই পারুল থমকে দাঁড়াল। কারুর কথাই অস্পষ্ট নয়। না রাধার, না তার বাপের।

রাধা পিঁড়িতে বসে। তার সামনে তার বাপ। হাতে একটা চিঠি।

—তখনই পই পই করে বলেছিলাম, বাইরের জঞ্জাল ঘরে ঢুকোস নি। বলে আপনি পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাকে। ফটিক তো স্পষ্টই লিখে দিয়েছে, ওই মেয়েছেল বাড়ী থেকে না গেলে এমন ঘরে সে বিয়ে

করবে না। তারাচরণকে সে খুব চেনে, তারই তো রক্ষিতা। এখন তাকে ফেলে সরে পড়েছে। রাধার সঙ্গে অমন মেয়েমানুষের কিসের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক? উটকো মেয়েছেলেকে ঘরে ঠাঁই দিতে হবে? তিনদিনের মধ্যে ফটিক জবাব চেয়েছে।

রাধা কি একটা বলতে যেতেই রাধার বাপ খিঁচিয়ে উঠল। আজ সে মরীয়া, মেয়েকে আমল দিয়ে দিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে। আর নয়। দুহাতে পারুল কান চাপা দিল, কিন্তু একটি কথাও হারাল না। স্পষ্ট প্রত্যেকটি অক্ষর। কথার এত অসহ্য দাহ আগে পারুলের জানা ছিল না।

টলতে টলতে পারুল ঘরের মধ্যে ঢুকল। আবছা অন্ধকারে সকলের নজর এড়িয়ে। কোনরকমে ঢুকে ছোট ট্রাঙ্ক আর কাঠের বাক্সটা হাতড়ে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

মাত্র তিন দিনের সময়। এর মধ্যে সরে যেতে হবে পারুলকে। ফটিকের দৃষ্টির বাইরে। রাধার সংসার থেকে অনেক দূরে।

টলমল করছে দুটো পা। খুব সাবধানে পা ফেলে পারুল মাঠের ওপর এসে দাঁড়াল।

একহাত কপালে রেখে চোখ কুঁচকে দেখল। একটা দুটো বাতি জ্বলে উঠেছে এদিক ওদিক, কিন্তু তবু পথের অন্ধকার ঘোচেনি।

অ্যাসফাল্ট-ঢাকা নির্মম কঠিন শড়ক। পৃথিবীর মানুষের মতনই মায়াহীন, মমতাহীন। পারুল দ্রুতপায়ে পথের ওপর এসে দাঁড়াল।

চৌরাস্তার কাছাকাছি এসে হাঁপ ছাড়ল। একটানা অতটা পথ এসে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গে আর একটা চিন্তাও দেখা দিল মনের মধ্যে। ঝোঁকের মাথায় ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। ভাবে নি কিছু। কিন্তু এতক্ষণ পরে মনে এল কথাটা।

পথে তো পা দিল, তারপর? কুসুমপুরে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ

কিন্তু আর কোন পরিচিত স্থানও নেই, যেখানে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য একটু বিশ্রাম নিতে পারে পারুল, শ্রম অপনোদন করতে পারে।

বেলেঘাটায় গিয়ে ওঠার প্রশ্নও অবান্তর। দারিদ্র্য-জর্জর সংসারে বাড়তি বোঝা। তা ছাড়া কুলে কালি দেওয়া মেয়েকে কে টেনে নেবে ঘরে। সমাজ ডিঙিয়ে, অনুশাসন অবহেলা করে, রাতের অন্ধকারে ঘর ছাড়া মেয়েকে দিনের আলোয় বাড়ীতে ঢুকতে দেবার মত বুকের পাটা পারুলের বাপের নেই। টাকার জোরও নয়।

সামনে সীমাহীন পাকা শড়ক। এ পথের হয় তো শেষ আছে কিন্তু পারুলের এ অনির্দেশ যাত্রার শেষ নেই। যাযাবরী জীবন-যাত্রার সবে শুরু। ক্ষণিকের ঘর বাঁধা আর ঘর ভাঙার খেলায় অবসাদ এলে চলবে কেন?

এ দিকে গাছের তলায় একটা সাইকেল রিক্সা। পারুলকে মোট ঘাট পথের ওপর রেখে দাঁড়াতে দেখে চালক ঘণ্টা বাজাল। ক্রিং, ক্রিং।

অসহ্য যন্ত্রণা গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। কিছু না ভেবেই পারুল হাত নেড়ে ডাকল। মোট তো ভারি! সবই তো ফেলে এসেছে পিছনে। বাসন কোসন, বেশীর ভাগ জামা কাপড়। এমন একটা যাত্রায় মোট-ঘাট যত কম থাকে ততই ভাল। রাজপথ শয্যা, আচ্ছাদন সুনীল আকাশ, বোঝা বাড়িয়ে লাভ?

চালকের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে পারুল বলল, স্টেশন। বলার পর খেয়াল হল। স্টেশন যে বলল, কিন্তু তারপর? যে কোন একটা ট্রেনের কামরায় উঠে পড়বে। প্রথম যে ট্রেন স্টেশন ছোঁবে, তাতেই। টাকা পয়সা যা আছে কিছু দিন হয় তো চলবে, তারপর গায়ের গয়না আছে। তারপর নিরন্ধ্র অন্ধকার। সামান্য আলোর ইশারাও নয়। অনশন আর অর্ধাশনের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা।

ভাড়া মিটিয়ে পারুল দু হাতে মোট তুলে নিল। হন হন করে প্ল্যাটফর্মে এসে উঠল। এমন ভাব, যেন কোথায় যাবে সব ঠিকঠাক। কোন অসুবিধা নেই।

ওয়েটিং রুমের বালাই নেই। দুটো কাঠের পার্টিশন দিয়ে একটু জায়গা ঘেরা। সেখানে একপাল হিন্দুস্থানী মেয়েছেলে আসন জুড়ে বসেছে। তিল রাখবার ঠাঁই নেই। পার্টিশনের বাইরে পারুল বসল। মোটগুলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

কাঞ্চন নগরে প্রথম দিন নামার কথা পারুলের মনে পড়ল। তারাচরণের পাশাপাশি। আশা আকাঙ্খায় রঙীন দিগন্ত। ঘর বাঁধার স্বপ্নে মেদুর দৃষ্টি দুটি চোখের। আবার এভাবে স্টেশন ফিরে আসতে হবে, কোন দিন পারুল ভাবে নি।

কেন এমন কাজ করল তারাচরণ! সচ্ছল জীবন কাম্য ছিল পারুলের, কিন্তু তার রসদ জোগাতে এমন গ্লানি আর কলঙ্কের কাদা ঘাঁটতে তো কোন দিন সে বলে নি। আর যদি সরেই গেল, অনায়াসেই তো পারুলকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারত। অজ্ঞাতবাসের পথে তাকে কাঁটা বলে কেন মনে করল!

পারুলের ইচ্ছা ছিল কাঞ্চন নগরেই থাকবে। কোন একটা আস্তানায়। যাতে তারাচরণ ফিরে এলেই দেখা হয়। কিন্তু আজকের এ ব্যাপারের পরে এখানে থাকা সম্ভব নয়।

আচমকা হাতে লাগতেই পারুল উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। চোখ ফিরিয়ে দেখল একটি লোক দাঁড়িয়ে। দুটো হাত বুকের ওপর যোড় করে, মাপ করবেন, তবলাটা নামাতে গিয়ে লেগে গিয়েছে।

হাতটা প্রসারিত করে পারুল বসেছিল, এই লোকটি তবলাটা নামাতে গিয়ে তার হাতে লেগে গিয়েছে। ঠিক নখের ওপর। এমন কিছু বেশী লাগে নি। পারুল আনমনা ছিল বলেই চেঁচিয়ে উঠেছে।

কিন্তু লোকটি ছাড়ল না। প্ল্যাটফর্মের টেপাকল থেকে রুমাল ভিজিয়ে এনে পারুলের হাতে দিল, নিন, জড়িয়ে নিন হাতে। নখে লাগলে বড্ড লাগে। এরপর ব্যথা হবে।

ত্থ একবার পারুল আপত্তি জানাল, কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা। তুজনের মাঝখানে তবলা তুটো রেখে ওপাশে বসল। জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। জামার তু একটা বোতাম খুলে দিল।

—ট্রেন শুনছি আধঘণ্টা লেট। কেলেঙ্কারী হবে দেখছি।

পারুল লোকটাকে আড়চোখে দেখল। গায়ে পড়ে আলাপ করছে। পথে ঘাটে এমন লোক দেখা যায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে ভাব করতে।

কিন্তু মুখ দেখে যেন তেমন বোধ হ'ল না। সত্যিই বিব্রত, মুখ চোখের এমন একটা ভাব।

হঠাৎ লোকটি ফিরল। পারুলের দিকে চেয়ে বলল, আপনি কতদূর যাচ্ছেন? সঙ্গে কেউ নেই?

সোজাসুজি উত্তরটা পারুল এড়িয়ে গেল।

—কাছেই। একলাই যাচ্ছি।

লোকটি আর বলল না কিছু। একটু পরে উঠে দাঁড়াল, আপনি একটু দেখবেন জিনিষগুলো, আমি এখনি আসছি।

জিনিষপত্রের মধ্যে তো বিছানা আর তুটি তবলা—বাঁয়া আর তবলা। ওর আর দেখাদেখি কি।

মিনিট কয়েক পরেই লোকটি ফিরে এল। হাতে পানের খিলি। পারুলের দিকে হাতটা প্রসারিত করে দিয়ে বলল, নিন্।

সেই সকালবেলা পারুল তুটি মুখে দিয়েছিল, তারপর থেকে দানাও পড়েনি পেটে। পাক দিয়ে উঠছে অন্ত্রগুলো। শুকিয়ে আসছে জিভ। তবু পানটা নিয়ে মুখের মধ্যে নাড়লে চাড়লে কিছুটা আরাম পাবে।

বাকি পানটা লোকটি মুখে ফেলে দিল। পকেট হাতড়ে জর্দার কৌটো বের করল। মুখে ছিটিয়ে দিয়ে পারুলের দিকে চেয়ে বলল, চলে?

পারুল মাথা নাড়ল।

আচ্ছা মানুষ তো! লজ্জাসরমের ধার ধারে না। এমন ভাবে পারুলের সঙ্গে কথা বলছে, পারুল যেন অপরিচিতা মহিলা নয়, বহুদিনের জানা কোন পুরুষ বন্ধু। একসঙ্গে দেশভ্রমণে চলেছে।

চেয়ে চেয়ে পারুল দেখল। একমাথা চুল, ঘাড় অবধি নেমেছে। মাজা রং। টানা দুটি চোখ অপূর্ব মমতায় উজ্জ্বল। দীর্ঘ নাসা। রীতিমত সুপুরুষ।

মাঝে মাঝে পারুলের দিকে চোখ ফেরাচ্ছে বটে, কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোন কৌতূহল নেই পরনারীর সম্পর্কে, কোন অভিসন্ধি নয়। যেমনভাবে এখানে ওখানে জড় করা মোটঘাটের দিকে দেখছে, ঠিক তেমনি ভাবেই দেখছে পারুলকে।

তালুতে জিভ ছুঁইয়ে লোকটি একটা শব্দ করল।

—কি মুস্কিলেই যে পড়েছি।

পারুল ভ্রূ কোঁচকাল। পাশে বসে অনর্গল একটা লোক আক্ষেপ করে যাবে আর সে বসে থাকবে চুপচাপ। শোনাই যাক না কথাটা। অবশ্য শুনবেই শুধু, মুস্কিল আসান করার কোন পথ বাতলাতে পারবে না। লোকটি আর কি মুস্কিলে পড়েছে, পারুলের সামনে চাপ-চাপ অন্ধকার, সূচীভেদ্য। আশার ক্ষীণ আলোও নেই।

—আপনার কিসের মুস্কিল? আচমকা পারুলের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ঘুরে বসল।

—আর বলেন কেন? বংশী, যে আমার সঙ্গে সব আসরে যেত,

সেই পড়েছে ম্যালেরিয়া জ্বরে। সাতদিনের ব্যাপার। ঘর অবশ্য জমিদার বাবুরা দেবেন, কিন্তু আমার খাবার বাছবিচার আছে, আমি ওদের ওখানে কিছু মুখে দিতে পারব না। কি খাই আর কোনটা খাই না, সব রংশী জানত। শুধু ফল খেয়ে সাতটা দিন কাটান কম মুস্কিল!

—খাওয়ার বুঝি আপনার খুব বাছবিচার? কথার পিঠে কথা বলার ভঙ্গীতেই পারুল প্রশ্ন করল।

—একটু ইতস্তত ভাব, সঙ্কোচের ছায়া চোখে মুখে। লোকটি দুটো হাত হাঁটুর ওপর রেখে আস্তে আস্তে বলল, একটু সাত্বিকভাবে থাকতে হয়, গুরুদেবের আদেশ।

সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত যোড় করে কপালে ঠেকাল। ভক্তিভরে।

আবার পারুল লোকটিকে আপাদমস্তক দেখল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

চেহারা পারুলের নিন্দার নয়। এর আগে লক্ষ্য করেছে, পথ দিয়ে গেলে অনেকেই চেয়ে চেয়ে দেখে। কেউ সোজা চেয়ে থাকে, কারুর বা চোরা চাউনি। কিন্তু এই লোকটি প্রায় গা ঘেঁষে বসেছে। মাত্র এক জোড়া তবলার ব্যবধান। অথচ ভাল করে চোখ তুলে চাইছেও না ওর দিকে। যখন চাইছে নিস্পৃহ চোখের দৃষ্টি। কৌতূহল নেই, নিরাসক্ত ভঙ্গী।

কিছুক্ষণ পরে লোকটি উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করল সামনে, তারপর পারুলের দিকে ফিরে বলল, আর একবার গাড়ীর খোঁজটা নিয়ে আসি।

মিনিট দশেক, মানুষটার পাত্তা নেই। আপন ভোলা লোক, হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বোধ হয় চলে গেল কোথাও। ফিরে না এলেই তো সর্বনাশ। এ তবলাদুটো নিয়ে পারুল কোথায় যাবে। নিজের মোট ঘাট নিয়েই অস্থির, তার ওপর বাড়তি বোঝা।

একটু পরেই লোকটি ফিরে এল। দুহাতে দুটি ে০.সাহচর্য লাভ পারুলের সামনে নামিয়ে রাখল আর একটি নিজে নিয়ে বসল।

—আজ রাতে আর ট্রেন আসছে না। মাঝপথে কোথায় মালগাড়ি উল্টেছে। সে সব সরিয়ে, ট্রেন আসতে সেই ভোরবেলা। তাই ভাবলাম রাতটা একেবারে উপোসে কাটবে। খেয়ে নিই কিছু।

—আমার জন্য কেন আবার আপনি এসব আনতে গেলেন? পারুল অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

—বা, আমি খাব আর আপনি বসে বসে দেখবেন। তা কখন হয়!

লোকটি হাসল। সাদা ঝকঝকে দাঁতের সার। হাসিরও যেন জাত আলাদা।

—নিন আরম্ভ করুন।

পারুল চেয়ে দেখল। গোটা দুয়েক ফল ছাড়ানো।

পারুলের দৃষ্টি লোকটির চোখ এড়াল না। মুচকি হেসে বলল, ভয় পাবেন না, আপনাকে শুধু ফল খাইয়ে রাখব না। আমি নিজে রাত্রে ফল ছাড়া কিছু খাই না। নিন, খেতে শুরু করুন।

পারুল পিছন ফিরে বসল। একটু ঘোমটা টেনে।

শালপাতা খুলে দেখল গরম লুচি, আলুর তরকারি আর একটা মিষ্টি।

চোখ ফেটে পারুলের জল এল। যাকে ভরসা করে রাতের আঁধারে পারুল ঘর ছেড়েছিল, সে লোকটা উধাও হয়ে গেল। অচেনা, অজানা আর এক মানুষের দয়া আর দাক্ষিণ্যে উদরপূর্তি করতে হচ্ছে। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি!

খাওয়ার পালা সাঙ্গ হতে বেশী সময় লাগল না। লোকটি জলেরও বন্দোবস্ত করল। এবার শোবার ব্যবস্থা। একটু সরে গিয়ে লোকটি বিছানা পাতল। বিছানা আর কি, একটা কম্বল তার ওপর পাতলা চাদর, আর একটা বালিশ।

সেই পড়েছেন সবের বালাই নেই। বিছানাপত্র আনার সুযোগই জমিদা— আঁচল পেতে শোবার উদ্যোগ করতেই বাধা পেল।

আপনি কি বাড়ী থেকে ঝগড়া করে এসেছেন নাকি ?

পারুল মুখ ফিরিয়ে রইল। সত্যিই তো, বিছানা না আনার কি কৈফিয়ৎ সে দেবে ?

কম্বল আর বালিশটা লোকটি এদিকে ছুঁড়ে দিল। পারুলের সামনে।

—একি সব আমায় দিয়ে দিলেন ? আপনি কিসে শোবেন ?

ততক্ষণে লোকটি চাদর পেতে শুয়ে পড়েছে। হাতে মাথা রেখে। পারুলের কথার উত্তরে কেবল বলল, সব আপনাকে দেব এমন নিঃস্বার্থ হতে পারলে আর ভাবনা ছিল কি। নিজেকে বাঁচিয়ে, তবে পরকে বিলোই।

একটু পরেই মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ। শোবার আগে ইষ্টনাম জপ।

ঘুমে পারুলের দুটো চোখ জড়িয়ে এল। গায়ে মাথায় ভাল করে কাপড় জড়িয়ে পিছন ফিরে শুল।

মাঝরাতে বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখে পারুল ধড়মড় করে উঠে বসল। গলা শুকিয়ে গিয়েছে। দু'চোখে অসহ্য জ্বালা।

লোকটি ঘুমাচ্ছে। নিশ্বাসের তালে তালে স্পন্দিত হচ্ছে চওড়া বুক। কঠিন প্লাটফর্মের ওপরও কোন অসুবিধা নেই। হাতটা সরে গেছে মাথা থেকে। ম্লান আলোয় চক চক করছে প্রশস্ত কপাল।

ঘুম চোখে পারুল অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখল।

হঠাৎ কথাটা মনে হল। ঘনকালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মতন। এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় পারুল আর কোথায় পাবে! নোঙর ছেঁড়া ভেসে বেড়ানো জেলে ডিঙ্গির পক্ষে শক্ত কূলের ইসারা।

দুটি রান্না করে দেওয়ার বদলে এমন দেবতুল্য মানুষের সাহচর্য লাভ ভাগ্যের কথা পারুলের।

হৈ চৈ চীৎকারে পারুলের ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হয়ে গেছে। জল দিয়ে প্ল্যাটফর্ম ধোয়া হচ্ছে। তারই আওয়াজ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লোকটি নেই। বিছানা গোটানো।

জিনিষ পত্র সরিয়ে পারুল উঠে দাঁড়াল। তবলাদুটো একপাশে রাখল। নিজের মোটঘাট পার্টিশনের ওপারে।

একটু পরেই লোকটি এসে দাঁড়াল। স্নান সেরে এসেছে। দীর্ঘ চুলের গোছায় তখনও চিক চিক করছে জলের ফোঁটা। কপালে রক্ত চন্দনের তিলক। কালাপাড় ধুতি, ধবধবে ফতুয়া।

চেয়ে চেয়ে পারুলের সাধ যেন মেটে না। মনে হল গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করবে। ক্লান্তি-জর্জর, ধূলিধূসর দেহটা লুটিয়ে দেবে। একটি প্রণামে নিবেদিত করবে নিজেকে।

সে সব কিছু করল না পারুল। রাজ্যের লজ্জা আর সঙ্কোচ। পাহাড় প্রমাণ বাধা। এমন একটা মানুষের সান্নিধ্যে যাবার অধিকারও বুঝি ওর নেই।

—মুখ হাত ধুয়ে নিন। এখনি গাড়ী আসবে।

যন্ত্রচালিতের মতন পারুল কলঘরে গেল। শুধু মুখ হাত ধুলেই হবে না, সারা দেহ ডুবিয়ে অবগাহন স্নান। দেহের ক্লেদই না হয় ঘুচল, কিন্তু মনের কলঙ্ক মুছবে কেমন করে।

পারুল ফিরে আসতেই লোকটি চলে গেল। একটু পরেই ছোকরা গোছের একজন পারুলের সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে ধূমায়িত দুধের ভাঁড়।

—কি? পারুল জিজ্ঞাসা করল।

—সাধুজী! পাঠিয়ে দিলেন। ছোকরাটি দুধের ভাঁড় পারুলের হাতে তুলে দিল।

সাধুজী! তারপর লোকটির চেহারার কথা মনে হতেই পারুল মুখ টিপে হাসল। ছোকরার আর দোষ কি। জটাতিলক দেখে সাধুজীই ভেবেছে।

দুধে শেষ চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি এসে দাঁড়াল।

নিন, এ দুটো রেখে দিন। আমার আবার পকেটের বালাই নেই।

দুটো টিকেট। কাঞ্চন নগর থেকে তমালপুর।

—দুটো টিকেট যে? মুখ ফুটে পারুল বলেই ফেলল।

লোকটি স্মিত হাসল, মেয়েছেলে বলে গাড়ীতে কি বিনা পয়সায় পার করবে ভেবেছেন? কাণ্ডারী বৈতরণী পার করেন তাও মাশুল চান। প্রেম, ভক্তি, প্রীতি। নিন, ঠিক হয়ে নিন। সিগনাল ডাউন হয়েছে।

ট্রেণ ছাড়ল সাতটা কুড়ি। একপাশে পারুল বসল। জিনিষপত্র, তবলা দুটো বেঞ্চের নিচে রেখে লোকটি বসল জানলা ঘেঁসে।

কোথায় তমালপুর কিছুই পারুল জানে না। এখান থেকে কতদূর। কখন পৌছবে, কে জানে!

বাইরে বিস্তৃত ধানজমি, ফণিমনসার ঝোপ, বাবলা গাছ, টেলিগ্রাফের তারের ওপর শঙ্খচিল আর মাছরাঙা পাখী।

এক সময় চোখ-অবধি টানা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সহযাত্রীর দিকেও দেখল। একটা রাতের আলাপ, তবু যেন মনে হল যুগান্তরের পরিচয়। দুটো গালে হাত রেখে লোকটি বাইরের দিকে একদৃষ্টে কি দেখছে। চাকায় চাকায় ছন্দোবদ্ধ আর্তনাদ, গাড়ীর ভিতরে জিনিষপত্র, মোটঘাটের ঠোকাঠুকিতে সু-সম ঝঙ্কার। আবহ যন্ত্র সঙ্গীতের মতন।

কোলাহলে পারুলের তন্দ্রা ভেঙে গেল। স্টেশন। অনেক লোকের ভিড়।

সঙ্গের লোকটি দাঁড়িয়ে উঠেছে।

শুনছেন, এবার নামতে হবে।

শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ মুছে পারুলও দাঁড়াল।

চনচনে রোদ। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। একটু এগোতেই দুটি ছোকরা সামনে এসে দাঁড়াল। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল।

ট্রেণের গোলমালের খবরে আমরা তো খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। জমিদারবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে। আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর লোক পাঠাচ্ছেন স্টেশনে।

—হ্যাঁ, রাস্তায় এক মালগাড়ী উল্টে পড়াতে ট্রেণ এত লেট। রাতটা আমাদের প্ল্যাটফর্মেই কাটাতে হয়েছে।

বহুবচনের উল্লেখে ছোকরা দুটি মুখ তুলে চাইল। দৃষ্টি পড়ল পারুলের দিকে। ঘোমটা টেনে পারুল জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে। কুলির পিছনে।

—ইনি?

—আমার এক আত্মীয়া। গানবাজনা খুব ভালবাসেন বলে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

—বেশ করেছেন। বেশ করেছেন।

স্টেশনের বাইরে ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। মোট ঘাট ছাদে তুলে দিয়ে ছোকরা দুটি দরজা খুলে দাঁড়াল।

কাছারি বাড়ির ফটকে আর এক দফা অভ্যর্থনা। ভিড়ের মধ্যে থেকে প্রৌঢ় একজন এগিয়ে এসে বলল, ভাবিয়ে তুলেছিলেন মশাই। আনওয়ারী বাই এসেছে অথচ হীরু তবলচী নেই, এ যেন লবণছাড়া তরকারি। জলসাই জমত না।

এই প্রথম পারুল লোকটির নাম জানতে পারল। হীরু তবলচী। এদের কথায়বার্তায় মনে হল গুণী শিল্পী।

জলসা সাতদিন, কিন্তু হীরু তবলচী তিনদিন আসরে নামল। খামখেয়ালী মানুষ। আনওয়ারী বাই আর পণ্ডিত মতি প্রসাদ ছাড়া আর কারো গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে রাজী হল না। হাতযোড় করে বলল, গুরুদেবের মানা। রামাশ্যামার সঙ্গে তবলায় ঠেকা দিলে আঙুলে কুষ্ঠ হবে।

ফেরবার দিন পারুলের কেমন ভয়-ভয় করল। এ কটা দিন বেশ কেটেছে হৈ চৈয়ের মধ্য দিয়ে। বিকাল হতেই চিকের আড়ালে গিয়ে বসা। গান আর বাজনা শোনা। এ সব পারুল খুব যে বোঝে এমন নয়, কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে সময়টা কেটে যায়, নিজের জীবনের অন্ধকার দিকটা ঢাকা পড়ে।

আবার সেই কাঞ্চন নগর। তারাচরণের দীর্ঘ ছায়া দুলবে সেখানে। মাণিকচাঁদ, রাধা, জানা শোনা অনেকগুলো লোক। পথ ঘাটে যদি মুখোমুখি হয়ে যায়। চিনতে পেরে যদি কেউ মুচকি হাসে।

পারুলের বরাত ভাল। হীরু তবলচী নামল বটে কাঞ্চন নগরে, কিন্তু বাসে চড়ে মাইল পঁচিশেক দূরে রতিগ্রামে গিয়ে থামল। ছোট কুঁড়ে। খড়ের চাল, মাটির দেয়াল। ঝকঝকে তকতকে উঠান। হীরু তবলচীর আস্তানা।

উঠানে নেমেই হীরু তবলচী চীৎকার করে ডাকল, বংশী, বংশী।

কাঁথা গায়ে কাঁপতে কাঁপতে বংশী এসে দাঁড়াল।

—কিরে জ্বর কমেনি এখন?

উত্তরে বংশী বিড় বিড় করে বলল, জ্বর কমেছে কিন্তু সারে নি একেবারে।

—নে, মালপত্রগুলো তোল।

মালপত্র তুলতে দু এক পা এগিয়েই বংশী থমকে দাঁড়াল। ঘোমটা টেনে গুটি গুটি কে এগিয়ে আসছে। ঠাকুরবাবা আবার এ বয়সে বিয়ে করে এল নাকি?

জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। যা মেজাজ ঠাকুরবাবার। এখনি হয় তো তবলার বদলে ওর মাথাতেই 'তেরে কেটে তাক' করে দেবে। এমনিতে একেবারে মাটির মানুষ, কিন্তু জলে উঠলেই সর্বনাশ।

মালপত্র গোছানো হলে হীরু তবলচী পারুলের দিকে ফিরল, এবার থেকে রান্নার ভারটা তুমিই নাও। এ কদিন তোমার রান্না খাওয়ার পর বংশীর রান্নায় মন ভরবে না।

তমালপুরে থাকতেই আপনির বন্ধন ঘুচে গেছে। পারুলই আপত্তি করেছে, না, না, আমায় আপনি বলবেন না। কত ছোট আমি আপনার চেয়ে। আমাকে তুমিই বলবেন।

হীরু তবলচী একদৃষ্টে পারুলের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলেছে, তথাস্তু।

দিন কুড়ি, তারপরই পারুল বিপদ বাঁধাল। ঘুম থেকে উঠে আর মাথা তুলতে পারল না। কপালের দুপাশে অসহ্য যন্ত্রণা। সমস্ত শরীরে ব্যথা।

বংশী বার দুয়েক ডেকে গেছে চৌকাঠের ওপার থেকে। এবার ডাকতে আসতেই পারুল তাকে হাত নেড়ে ডাকল।

—আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। তোমার ঠাকুরবাবা কোথায়?

—নদীতে গেছেন। আপনার দুটো চোখ খুব লাল হয়েছে কিন্তু। জ্বরটর হয়নি তো?

—বোধ হয় হয়েছে। মাথায় খুব যন্ত্রণা। উঠতেই পারছি না।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠানে খড়মের শব্দ। গঙ্গাস্তোত্র।

—কিরে বংশী?

—এনার বোধ হয় জ্বর হয়েছে ঠাকুরবাবা। বিছানা ছাড়তে পারছেন না।

—তাই নাকি। চৌকাঠের বাইরে খড়ম খুলে হীরু তবলচী ভিতরে এসে ঢুকল।

পারুল চেষ্টা করেও চোখ তুলতে পারল না। ভারি দুচোখের পাতা। চোখের সামনে সব কিছু অস্পষ্ট।

বিকালের দিকে পারুল চোখ খুলল। একেবারে কোণের দিকে কমানো হ্যারিকেন। ম্লান দীপ্তি। কিন্তু দেখতে কোন অসুবিধা হল না। ঠিক মাথার কাছে হীরু তবলচী।

চোখ খুলতেই হীরু তবলচী পারুলের দিকে ঝুঁকে পড়ল, কেমন লাগছে?

কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত রাখল পারুলের কপালে। মুহূর্তে কপালের সমস্ত দাহ যেন জুড়িয়ে গেল। সব যন্ত্রণার অবসান।

—একটু ভাল। খুব আস্তে, জড়ান গলায় পারুল উত্তর দিল।

—কবিরাজ মশায়কে ডাকতে পাঠিয়েছি, এখনই এসে পড়বেন।

পারুল নিজের একটা হাত দিয়ে হীরু তবলচীর হাতটা কপালে চেপে ধরল। ভাবটা যেন, ওষুধ বিষুধ নয়, এমন একটা স্পর্শেই ওর সব রোগ ভাল হয়ে যাবে। সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে পরিস্কার।

এমনি ভাবে পারুল মাঝে মাঝে চোখ খুলেছে। কখনও জ্বরতপ্ত ললাটে অসীম মমতায় হীরু তবলচী হাত বুলিয়ে চলেছে, কখনও নিবিষ্ট মনে খলে ওষুধ মাড়ছে, আবার কখনও সযত্নে খাইয়ে দিচ্ছে ওষুধ আর অনুপান।

ক্রমে জ্বরের প্রকোপ কমিল, কিন্তু হীরু তবলচী বিছানা ছাড়ল না।

এক রাত্রে অঘটন ঘটল।

আচমকা পারুলের ঘুম ভেঙে গেল। খুব তৃষ্ণা। উঠে কুঁজো থেকে জল গড়াতে সাহস হল না। এখনও শরীর ভারি দুর্বল।

পাশ ফিরে হীরু তবলচীর খোঁজ করতে গিয়েই পারুলের চোখে পড়ল। স্বল্প পরিসর বিছানার একপাশে গুটিসুটি দিয়ে হীরু তবলচী শুয়ে পড়েছে। উঠে পাশের ঘরে যাবার কথাটা খেয়াল হয়নি।

আস্তে আস্তে পারুল উঠে বসল। দেয়াল ধরে খুব সাবধানে। সন্তর্পণে হীরু তবলচীর মাথাটা উঁচু করে নিজের বালিশটা দিয়ে দিল। বিপদ ঘটল চাদরটা গায়ের ওপর টেনে দেবার সময়। হাত দুটো একটু সরাতে যেতেই হীরু তবলচী দু হাত দিয়ে পারুলকে আঁকড়ে ধরল। নিমীলিত দুটি চোখ, কিন্তু দুটো ঠোঁট বিড়বিড় করে উঠল। প্রথমে অর্ধস্ফুট, তারপর স্পষ্ট শোনা গেল, সরমা, সরমা।

দু একবার মাথা তুলতে গিয়েও পারুল পারল না। থরথর করে কাঁপছে সমস্ত শরীর। চোখের সামনে পুঞ্জীভূত অন্ধকার, দুর্বল ধমনীতে রক্তের কল্লোল।

খুব ধীরে গাঢ় কালো একটা যবনিকা নেমে এল চোখের সামনে। পারুল চেতনা হারাল।

যখন চোখ খুলল তখন বেলা অনেক। শরীর অনেকটা ভাল। উঠতে পারুলের কোন কষ্ট হল না। জ্বর নেই, সামান্য একটু দুর্বলতা। বিছানায় উঠে বসেই রাত্রের কথাটা মনে হল।

সবল শক্ত কাঠামো আর ঋষিকল্প মনের অন্তরালে কোথায় লুকানো ছিল এ দুর্বলতা। সরমা, সরমা আবার কে?

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পারুল একদিন জিজ্ঞাসা করে ফেলল।

দাওয়ায় বসে হীরু তবলচী তবলায় কি একটা বোল বাজাচ্ছিল। আঙুলের ছোঁয়ায় যেন মেঘের ডাক। বুকের ভিতরটা পর্যন্ত গুড়গুড় করে উঠে।

পারুল কাছেই বসে ছিল দেওয়ালে হেলান দিয়ে। তবলা থামতে বলল, একটা কথা আপনাকে অনেকদিন ধরে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি, কিন্তু সাহস হচ্ছে না।

হাতুড়ি দিয়ে তবলায় ঘা মারতে মারতে হীরু তবলচী বলল, এত দেশ থাকতে এমন একটা এলাকায় কেন বাসা বেঁধেছি এই তো? আমি এখানে এসেছি অনেক আগে, তারপর ওরা সব এসেছে। অঙুল দিয়ে হীরু তবলচী রাস্তার ওপারের দিকে দেখাল।

রাস্তার ওপারে ছড়ানোভাবে টিনের চালাঘর। কারা থাকে পারুলের অজানা নয়। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে গানের সুর ভেসে আসে। বেতালা চীৎকার।

কিন্তু এদের কথা পারুল জিজ্ঞাসা করেনি।

—আমি এ কথা বলতে চাইনি আপনাকে।

—তবে, তবলা সরিয়ে হীরু ঘুরে বসল। দুচোখে কৌতূহলের রোশনাই। পারুল প্রথমে মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিল তারপর বলল, সরমা কে?

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতন হীরু তবলচী চমকে উঠল। কুঁচকে এল মোটা ভ্রু। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত।

—তুমি কি করে জানলে? তুমি কে?

দেবার মত পরিচয় পারুলের নেই, তাই সেই প্রশ্ন পারুল এড়িয়ে গেল। কেমন করে জানল, সেই কথাই বলল খুব ধীর গলায়।

খুব মন দিয়ে হীরু তবলচী সব শুনল। মাটিতে চোখ রেখে, তারপর বলল, প্রথম যৌবনে একটি মেয়েকে ভাল লেগেছিল। মন

দেওয়া নেওয়ার পালাও শেষ করেছিলাম, কিন্তু বিয়ে আমাদের হয়নি। তার বাপ আমার মতন এমন তবলা বাজিয়ে-র হাতে মেয়েকে দিতে রাজী হননি! আমার ভয়ে মেয়েকে নিয়ে পশ্চিমে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন।

কথা শেষ করে হীরু হাসল। কান্নার ছিটে মেশানো সে হাসিতে।

—আশ্চর্য কাণ্ড, হীরু শান্ত গলায় শুরু করল, সরমার সঙ্গে তোমার মুখের অদ্ভুত মিল। স্টেশনে তোমায় দেখেই চমকে উঠেছিলাম।

অনেকক্ষণ পরে পারুল জিজ্ঞাসা করল, সেই থেকেই বুঝি এমন জীবন যাপন করছেন?

হীরু ঘাড় নাড়ল, উঁহু, তা আর পারলাম কই। মায়ের অনুরোধে বিয়ে করেছিলাম কিন্তু বরাতে টিকল না। বছর খানেকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎ হীরু উঠে দাঁড়াল। বংশীকে ডেকে বলল, তবলা দুটো তুলে রেখো তো। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

হীরু চলে যাবার পর পারুল চুপচাপ বসে রইল, হাঁটুতে মুখ রেখে। সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। পারুল যদি সরমা হতে পারত, তা হলে আর সে কিছু হতে চাইত না। এমন একটা মানুষের ভালবাসা পাওয়া কম ভাগ্যের কথা!

পরের দিন হীরু পারুলকে ডাকল নিজের ঘরে। তক্তপোশের ওপর হীরু তবলচী, সামনে খোলা বাক্স।

—ডাকলেন? পারুল দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

—ভিতরে এস।

পারুল ভিতরে এল। রং বেরংয়ের অনেকগুলো শাড়ী, এক কোণে কতকগুলো সোনার অলঙ্কার। হার, নাকছাবি, চুড়ির গোছা।

—এগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। তুমি মাঝে মাঝে পরতে পার এসব। আমার সঙ্গে দু একটা আসরে যখন যাবে, তখন সেজে যেতে পার। এসব তো কোন কাজে লাগবে না। তুমি নাও এগুলো বুঝলে?

হীরুর মুখের ভাবে মনে হল সযত্নে সঞ্চয় করা শাড়ী গয়নার রাশ যেন সরমার হাতেই তুলে দিচ্ছে। কে জানে মনে মনে হয়তো এমন একটা ইচ্ছাই তার ছিল। কোনদিন যদি মুখোমুখি সরমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো সব কিছু তার হাতে তুলে দেবে।

—আমি এত সব কি করব, পারুল খুব আস্তে বলল, তার চেয়ে,—শুকনো ঠোঁট পারুল জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল,—তার চেয়ে সরমাদেবীর সঙ্গে কোনদিন যদি আপনার দেখা হয়—

পারুল কথা শেষ করতে পারল না। হীরু তবলচীর দুচোখে আগুনের ফুলকি, জলদ-গম্ভীর কণ্ঠ।

—না, তা আর সম্ভব নয়।

কোন কথা নয়। অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল দুজনে। পারুল আস্তে আস্তে পিছু হেঁটে হেঁটে এ ঘরে ফিরে এল।

হীরু তবলচী যেন বদলে গেল। জলসার আসরে কেউ ডাকতে এলে ফিরিয়ে দেয় তাদের। কাতর অনুরোধেও কোথাও যেতে রাজী হয় না। পারুলের সঙ্গে বেশী কথা নয়। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত পারুল দাওয়ায় খড়মের শব্দ শোনে। অস্থিরচিত্ত একটা মানুষের পদচারণা।

সে রাতে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। যেমনি হাওয়ার বেগ, তেমনি প্রচণ্ড বর্ষণ। তাল নারকোল গাছের মাথাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ল। মেঘের গর্জনে মাটি কেঁপে উঠল।

পারুল বিছানার ওপর উঠে বসল। বৃষ্টির ছাঁটে বিছানার অনেকটা ভিজে গেছে। জানলা বন্ধ করতে গিয়েই চোখে পড়ল। বিদ্যুতের আলোয় একটা মানুষের কাঠামো। এই ঝড় বাদলে হীরু তবলচী দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

পারুল মেঝেয় নেমে পড়ল। দরজা খুলে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। সাড়া নেই মানুষটার, চেতনা নেই।

পারুল খুব কাছে দাঁড়াল। ডাকল দু একবার, কিন্তু হীরু তবলচীর জ্ঞান নেই। বাতাসে দীর্ঘ চুলগুলো উড়ছে। সমস্ত শরীর জল-সিক্ত।

পারুল হাত বাড়িয়ে একটা হাত ধরল, ভিতরে চলুন। বৃষ্টিতে যে ভিজে গেছেন একেবারে।

চোখের পলকে ব্যাপারটা ঘটে গেল। প্রবল আকর্ষণে হীরু তবলচী পারুলকে নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে এল। দুহাতে মুখটা তুলে ধরে নিজের মুখটা নামিয়ে আনবার মুখেই বাধা পেল। বিদ্যুতের তীব্র আলো। কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই।

—কে, কে? চীৎকার করে হীরু তবলচী পারুলকে ঠেলে সরিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজে নেমে গেল উঠানে। তুমুল বর্ষণের মধ্যে মানুষটাকে আর দেখা গেল না।

খুব ভোরে পারুলের ঘুম ভেঙে গেল, স্তোত্রপাঠের শব্দে। খুব জোরে জোরে শ্লোক আওড়াচ্ছে হীরু তবলচী। শান্ত, নিরুত্তেজ চেহারা। গত রাত্রের ঝড়ঝাপটার চিহ্নমাত্র নেই।

উঠানে অনেকগুলো পায়ের শব্দ হতেই পারুল ফিরে চাইল। জনতিনেক লোক।

—হীরালালবাবু আছেন?

পারুল উত্তর দেবার আগেই হীরু বেরিয়ে এল।

এঘর থেকে তাদের কথাবার্তা পারুলের কানে এল। নন্দীপুরের ছোট তরফ। দুদিন জলসার আয়োজন। দূর দূরান্ত থেকে নাম করা গাইয়েরা আসছেন। হীরু তবলচীকে যেতে হবে সঙ্গত করতে। প্রত্যেক বছরই এখানে যায় হীরু। এবারেও রাজী হয়ে গেল। শুধু রাজীই নয়, একেবারে সঙ্গেই রওনা হয়ে গেল। জামা কাপড় পরে রাস্তার ওপারে দাঁড়ান গরুর গাড়ীতে গিয়ে উঠল। পিছন দিকে একবার ফিরেও দেখল না।

পারুল বংশীকে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ বংশী, তোমার ঠাকুর বাবা কবে ফিরবেন কিছু বলে গেছেন ?

বংশী ঘাড় নাড়ল. আজ্ঞে না, এবার তো কিছু বলেই গেলেন না। তবে অন্যবার নন্দীপুর থেকে দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসেন।

দিন তিনেকের মধ্যেই হীরু তবলচী ফিরে এল, কিন্তু হেঁটে নয়।

পারুল দাওয়ায় বসে ছিল, ব্যাপার দেখে ছুটে উঠানে গিয়ে দাঁড়াল।

ভিড়ের মধ্যেই একজন ঘটনাটা বলল। ফেরবার সময় হীরু তবলচী গাড়ীতে ওঠেনি। চাঁদনী রাতে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটেই আসছিল। কেমন একটু আনমনা। সঙ্গীদের কথার কখনও উত্তর দিচ্ছিল, কখনও চুপচাপ। ঠিক মুকুন্দগড়ের কাছাকাছি রথের মেলার মাঠের মাঝ বরাবর সর্বনাশ হল। কেয়া ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই হীরু তবলচী চীৎকার করে উঠল।

সাপটাকে অনেকেই দেখেছে। মাথায় চক্র, চাঁদের আলোয় প্রসারিত ফণা। ঠিক হাঁটুর নিচে কালো দুটি দাগ। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে লোক ছুটল। মোমিন গাঁয়ের বিখ্যাত ওঝা রহিম শেখ। কিন্তু কিছু হল না।

এ সমস্ত কথার কিছুটা পারুলের কানে গেল, বাকিটা শুনলই না।

একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল। নীল সারা দেহ! ঠোঁটের দু'পাশ মিলিয়ে সাদা সাদা ফেনা, অর্ধনিমীলিত দুটি চোখ। শান্ত সমাহিত স্মৃতি। শিবনেত্র।

সাপের আর কতটুকু বিষ! তার চেয়েও বিষধর কালনাগিনীর সমস্ত বিষ হরণ করেছে হীরু তবলচী। সমস্ত পাপ, সমস্ত কলঙ্ক নিজে টেনে নিয়েছে। সংসার সমুদ্র মন্থনে সবটুকু বিষ পান করেছে, অন্য সবাইকে অমৃত বিলোবার জন্যই।

হেঁট হয়ে গলায় আঁচল দিয়ে পারুল হীরু তবলচীকে প্রণাম করল।

হীরু তবলচীর আস্তানা পারুলের আর ভাল লাগল না। নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বংশী ঘর ছাড়ল। আর এক রাতে গরুর গাড়ী ডেকে মোটঘাট বেঁধে নিয়ে পারুলও রওনা হয়ে পড়ল। পথ আর তার কাছে অচেনা নয়। সঙ্কোচ, জড়তা দু' পায়ে মাড়িয়ে চলতে পারুলের আর কোন অসুবিধা হয় না।

পারুল নিঃসম্বলও নয়! হীরু তবলচীর দেওয়া গহনার রাশ আর জমানো টাকা পেটকাপড়ে বেঁধে নিয়েছিল।

কাছাকাছি শহরে আর নয়। পারুল পাড়ি দিল দূরদূরান্তরের তীর্থস্থানে।

প্রথমে কাশী, তারপর বৃন্দাবন, আবার ঘুরে কাশী। গায়ের গহনা বেচে খরচ মেটানো। একটা পেট, তীর্থস্থানে অসুবিধা কিছু নেই। মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে ভোগ জোগাড় করলেই দু বেলা খুব চলে যায়। কিন্তু ধর্মশালায় তিনদিনের বেশী থাকবার জো নেই। তারপর থাকতে গেলেই পয়সা লাগে। তা ছাড়া এদিক ওদিক একটা মানুষের টুকিটাকি খরচ আছে বৈকি। বিশেষ করে মেয়েমানুষের।

প্রথমবার কাশী এসেই পারুল অঙ্গে গৈরিকবাস জড়িয়েছিল। মন

এঁঘর পেশয়, কাপড় ময়লা হয় কম। তার ওপর ধর্মক্ষেত্রে এ ছোট অবারিত দ্বার। কোথাও কেউ বাধা দেয় না।

চেনা পাণ্ডা। স্টেশনেই দেখা হল। দেখা হতেই এগিয়ে গেল পারুলের দিকে।

—আসুন মা। আমি জানি বৃন্দাবনে আপনার মন টিকবে না। সেরা তীর্থ হচ্ছে বাবা বিশ্বনাথের ধাম।

উত্তরে পারুল মুচকি হাসল। সব কথা পাণ্ডাকে বলা চলে না। মনের মধ্যে আগুন জ্বলছে পারুলের। তার শিখায় সব কিছু পুড়ে ঝলসে যাচ্ছে। এক দণ্ড কোথাও শান্ত হয়ে বসতে দিচ্ছে না। বিগ্রহের সামনে চোখ বন্ধ করে বসে দেখেছে। শান্তি পায় নি। চোখ চেয়ে আত্মনিবেদন করতে গিয়েও হার মেনেছে। চোখের সামনে থেকে বিগ্রহ উধাও। তার বদলে চেনা জানা একরাশ মানুষ দাঁড়িয়েছে ভিড় করে। সেকেণ্ড মাস্টার আর তবলচী হীরালাল। ফাঁকে ফাঁকে তারাচরণের মুখের অস্পষ্ট আদল।

এ জীবন পারুল চায় নি। মনের মানুষকে নিয়ে নিরালায় ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু দমকা হাওয়ায় শুধু ঘরই ভাঙল না পারুলের, তাকেও টেনে এনে ফেলল পথের ধুলোয়। পুরুষমানুষকে তার আর বিশ্বাস নেই। প্রয়োজন ফুরোলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে হাত থেকে। কাদা লাগল, কি গুঁড়িয়ে গেল আঘাতে, ফিরেও দেখবে না। তার চেয়ে এই ভাল। যতদিন সোনার শেষ টুকরোটুকু অঙ্গে থাকবে, এই ভাবে পারুল ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। বৃন্দাবন থেকে কাশী, দরকার হলে হরিদ্বার, লছমনঝোলা। তারপর একদিন সম্বল শেষ হলে রাত্রের অন্ধকারে গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়াবে। কলঙ্ক মোছার চেষ্টা নয়, নিজেকে মোছা সম্পূর্ণভাবে।

সারাটা দিন এদিক ওদিক ঘুরে সন্ধ্যানাগাদ পারুল গিয়ে বসত

বিশ্বনাথের মন্দিরে। আরতির সময়। ধূপের ধোঁয়ায় মূর্তি মিলিয়ে যেত। শাঁখ আর ঘণ্টার অশ্রান্ত কলরোল। তবু কিছুটা বিস্মৃতি। জ্বালাময় জীবন থেকে।

সেদিন গঙ্গার ঘাটে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল পারুলের। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যখন মন্দিরে এসে পৌছল, তখন আরতি শুরু হয়ে গেছে। পা মুড়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে মুখ তুলতে গিয়েই পারুল লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

একেবারে সামনের সারিতে একটি ভদ্রলোক। টুকটুকে গায়ের রং, একমাথা কোঁকড়া চুলের বাহার, আয়ত দুটি চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি।

বিরক্তিতে পারুলের ঠোঁট কুঁচকে এল। আচ্ছা, নির্লজ্জ লোক তো। বিগ্রহের দিকে চোখ নেই, কেবল এদিকে ওদিকে নজর! মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে পারুল ঘুরে বসল।

আবার দেখা হল আরতি শেষ হবার পর। মন্দিরের চাতালে। বিধবা প্রৌঢ়া, পরণে গরদ। জীবনের অপরাহ্ন, কিন্তু সারা দেহে এখনও যৌবনের অস্তরাগ। তার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রলোক। হাতে পূজার নির্মাল্য। এবারও চোখ তুলে পারুল থতমত। ভদ্রলোক একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। পারুল পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল।

সারা রাত পারুল ছটফট করল বিছানায়। এ পাশ আর ও পাশ। যত রাজ্যের উদ্ভট সব চিন্তা। নভোচারী পাখীরও ক্লান্তি আসে। ডানা গুটিয়ে বিশ্রাম নিতে সাধ হয়। ছুটোছুটি করে পারুলও কম পরিশ্রান্ত হয় নি। ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি চিনতে পারুলের ভুল হয়নি। বিছানা ছেড়ে একসময় পারুল উঠে পড়ল। দাওয়ার কোণে রাখা বালতি থেকে জল নিয়ে মুখে মাথায় থাবড়াল। দপ দপ

করছে কপালের দুদিকের শিরা! অসহ্য উত্তাপ দু কানে। কয়েক ফোঁটা জলে কিছু হবার নয়, গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে যদি বসে থাকতে পারত পারুল, কিংবা জলের অতলে ডুবিয়ে দিতে পারত নিজেকে।

সকালে উঠেই পারুল মন ঠিক করে ফেলল। আর এখানে নয়। অন্য কোথাও সরে যেতে হবে। প্রয়াগ, হরিদ্বার, বৃন্দাবন।

গঙ্গাস্নান সেরে পারুল অনেকটা শান্ত হল। আবার কোথায় ঘুরে বেড়াবে! সামান্য যা পুঁজি কোনরকমে এইখানেই দিন কাটাতে হবে। একটা উটকো লোকের চাউনির ভয়ে দেশান্তরী হবে!

বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢুকতেই নজরে পড়ল। এবার আরো কাছে। গরদের পাঞ্জাবির ওপর বেলফুলের মালা জড়ান। কীর্তনের তালে তালে দুলছিল, পারুলের চোখে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে বসল।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে পারুল বার দুয়েক চেয়ে চেয়ে দেখল। বয়স খুব কম। প্রথম যৌবনের চাপল্য এখনও মুখ-চোখের ভাবে।

ভদ্রলোক চেয়ে রয়েছে। নিষ্পলক দৃষ্টি। চোখাচোখি হতেই পারুল উঠে দাঁড়াল। একঘেয়ে কীর্তন। এর চেয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলে ঝির ঝিরে হাওয়ায় ভালই লাগবে।

বেশীদূর নয়, মন্দিরের এলাকা পার হয়ে আধো অন্ধকার গলির মুখ বরাবর যেতেই আওয়াজ কানে এল।

—শুনছেন?

ঘাড় ফেরাল না পারুল। কোন উত্তর দিল না।

আন্দাজে বুঝল পিছনে একটি লোক এসে দাঁড়াল।

—আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

ঘোমটা একটু তুলে পারুল ফিরে চাইল। সেই ভদ্রলোক। গলার মালা হাতে জড়ান।

মনে মনে হাসি এল পারুলের। শুধু সব শিয়ালেরই এক রা নয়, সব পুরুষেরও। একটু আস্কারা দিলেই গলা কাঁপিয়ে প্রেম নিবেদন করবে। ঘর বাঁধার প্রতিশ্রুতি। তারপর খেয়াল মিটলেই আস্তে আস্তে সরে দাঁড়াবে। তারাচরণের মতন।

তবু পারুল চাপাস্বরে বলল, আমার সঙ্গে কি কথা আপনার?

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করল। কোঁচার খুঁট হাতে চেপে এদিক ওদিক চাইল। আস্তে বলল, এখানে ঠিক বলার সুবিধা হবে না। আপনার আস্তানায়—

কথা শেষ হবার আগেই পারুল দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আমার কোন আস্তানা নেই, আপনার যা বলবার এখানেই বলতে পারেন।

ভদ্রলোক রাস্তায় পা ঘসল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, যদি অসুবিধা না হয় দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে যাবেন?

পারুল আর কথা বাড়াল না, হন হন করে এগিয়ে গেল। আওয়াজে বুঝল ভদ্রলোকও আসছে পিছন পিছন।

দশাশ্বমেধ ঘাট ফাঁকা নয়। এধারে ওধারে লোকের জটলা। কথকতা চলেছে। কোথাও নাম গান।

পারুল সিঁড়ি বেয়ে নেমে একেবারে জলের কাছাকাছি গিয়ে বসল। ঘুরে দেখল ধাপের ওপর রুমাল পেতে ভদ্রলোকও বসেছে।

—এভাবে গায়ে পড়ে আলাপ করার জন্যে মাপ করবেন। একটা কথা শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। এখানে আপনার কে আছেন?

গঙ্গার স্রোতের দিকে মুখ ফিরিয়ে পারুল বলল, কেউ না। কিন্তু এ সব খোঁজে আপনার প্রয়োজন?

চড়া গলার সুরে ভদ্রলোক একটু বিব্রত বোধ করল, কিন্তু তখনই সামলে নিয়ে বলল, প্রয়োজন? তবে সব কথা শুনুন।

পারুল মন দিয়ে সব শুনল।

ভদ্রলোকের নাম অমিয়নাথ মজুমদার। মাকে নিয়ে তীর্থে এসেছে। ক'লকাতার 'বাণীপীঠ' থিয়েটারের বাঁধা লেখক। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক কর্তাদের ফরমাস মত নাটক লিখে দিতে হয়। কোনটা ওতরায়, কোনটা এক সপ্তাহেই খতম। দোষ সব সময়ে লেখার এমন নয়। পুরোনো, পচা মুখ আর দেখতে চায় না লোকেরা। বিয়াল্লিশ বছরের তরুবালাকে কাঁহাতক আর মেজে ঘসে আঠারো বছরের তরুণী নায়িকায় দাঁড় করান যায়। ওরই মধ্যে একটু যারা নতুন মুখ, ছোটখাটো পার্টে নাম করছিল, সিনেমার মোহে সব সরে পড়ল আস্তে আস্তে। কায়ার চেয়ে দর্শক ইদানীং ছায়ার দিকেই ঢলেছে বেশী। কর্তাদের হুকুম হয়েছে নতুন মুখ আমদানী করার।

বেশ কদিন ধরে অমিয়নাথ লক্ষ্য করেছে পারুলকে। যে ধর্মশালায় পারুল উঠেছে তার খবরও অমিয়নাথ রাখে।

এ লাইনে ভদ্রলোকের মেয়েরাও অনেকে আসছেন আজকাল। তাই ভাবলাম যদি আপনি রাজী থাকেন। আগ্রহে অমিয়নাথ পারুলের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

রাজী! পারুল উত্তর দেওয়ার মত কিছু পেল না। নতুন মুখের খোঁজে বুঝি পারুলের পিছু নিয়েছে ভদ্রলোক। অতলে তলিয়ে যাওয়া মেয়েকে হাত ধরে তুলবে পাদ-প্রদীপের আলোয়। কলঙ্কের ছোপ উঠিয়ে দু'গালে রঙের ছোপ লাগাবে।

—এ বিষয়ে আপনার স্বামীর মত নেওয়ারও প্রয়োজন হবে। যদি সম্মত থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

এত কষ্টেও পারুলের হাসি এল। স্বামীর মত! কুসুমপুরের সেকেণ্ড মাস্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? রাতের অন্ধকারে ঘর ছাড়া বউয়ের স্টেজে নামার অনুমতি।

আঁচলের খুঁট দিয়ে পারুল ঠোঁটের দুটো কোণ মুছে নিয়ে চাপা গলায় বলল, স্বামীর মত নেওয়ার কোন প্রয়োজন হবে না।

উত্তর শুনে অমিয়নাথ খুব আশ্চর্য হল না। আজ সাত আট বছরের ওপর রয়েছে এ লাইনে। চলা ফেরা, মুখ চোখের ভাব দেখলে ঠিক বুঝতে পারে। স্বামীর ছায়ায় বাস করা মেয়ে যে এ নয়, তা এক নজরেই বুঝতে পেরেছিল। এধার ওধার খোঁজ খবর কম নেয়নি। পাণ্ডাকে আড়ালে ডেকে বিস্তৃত বিবরণ, পুরুষ সঙ্গী কেউ নেই, এমন কাঁচা বয়স, একলা একলাই ঘুরে বেড়াচ্ছে এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে। খুব সম্ভব মনে ঘা খেয়ে সংসার ছেড়েছে। হয়তো স্বামীর অত্যাচারে, কিংবা উটকো মানুষের হাতছানিতে। যে কারণেই হোক ভুলিয়ে ভালিয়ে এমন মেয়েকে থিয়েটারে নিয়ে তুলতে পারলে অমিয়নাথের বরাত খুলে যাবে। শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে নিতে পারলে আর দেখতে হবে না। নিজের চোখে অমিয়নাথ দেখেছে। মুখ দিয়ে কথা সরে না, ষ্টেজে দাঁড়ালেই থর থর করে পা কাঁপে, ঘামে মুখ চোখ ভিজে ওঠে, কিন্তু ঐ দিন কতক। তারপর আর চেনবার উপায় থাকে না। এমনভাবে ঘোরাফেরা করে যেন ষ্টেজেই জন্ম। মাস ছয়েকের মধ্যে মাটিতে পা ঠেকে না। ডানা গজালে বুঝি আকাশেই উঠত। সে সব মেয়ে তো সাধারণ স্তরের। নাক চোখের বালাই নেই। অমাবস্যাকেও লজ্জা দেওয়া দেহের রং। আর এমন মেয়ে পেলে তো কথাই নেই। বুলি ফুটলে আর দেখতে হবে না।

—কিন্তু, আমতা আমতা করল পারুল, আমি তো কোনদিন এসব করি নি। অত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে পার্ট বলা ?

খুব ভাল লাগল অমিয়নাথের। এই ভয়পাওয়া ভাবটুকু।

—সে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। তালিম দেওয়ার লোক

আছে। ঠিক শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। অমিয়নাথ গলায় সান্ত্বনার সুর আনল। অভয় দেবার ভঙ্গী। তারপর কোঁচা দিয়ে জুতো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, বুঝতেই পারছি আঘাত পেয়ে পথে বেরিয়েছেন। ফেলে আসা জীবন ভুলতে গেলে কিছু একটা অবলম্বন চাই বৈ কি!

এতক্ষণ পারুল চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল। আঁচল দিয়ে ঠোঁট চেপে। কিন্তু অমিয়নাথের সহানুভূতি মাখান গলার স্বরে জল ভরে এল চোখের কানায় কানায়। খুব আস্তে, প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, কিছু একটা জুটিয়ে দিন আমাকে। আমি আর পারছি না। সমস্ত জীবন বিষিয়ে উঠেছে আমার।

অমিয়নাথ উঠে দাঁড়াল। আরো একটু এগিয়ে এল কাছে। বলল, ছি, কাঁদবেন না এভাবে। দিন তিন চারেকের মধ্যেই সব যোগাড় করে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হব।

মাঝ রাত পর্যন্ত পারুল বিছানায় ছট্‌ফট করল। এক জীবন থেকে আর এক জীবন। এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশ। দম ফেলার সময় নেই, বিরতি নেই, কিন্তু এই বুঝি ভাল। একটানা চলা। থামলেই পুরোনো দিনের ছবির টুকরো মনের সামনে ভেসে ওঠে। পুরোনো ঘটনা আর পুরোনো মানুষ। ধারাল দাড়া দিয়ে চেপে ধরে হৃৎপিণ্ড। নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার সামিল।

তার চেয়ে এ জীবন মন্দ কি! মুকুট, ওড়না, জড়োয়া পোষাকে এক রাতের বেগম। একটা মানুষের মুগ্ধ দৃষ্টি নয়, হাজার মানুষের স-প্রশংস চাউনির সামনে দাঁড়ান। যদি উৎরে যায় তবে সৌভাগ্যের অন্ত নেই। আর যদি তা না হয়, ঘন অন্ধকারে আবার ডুবে যাবে। পায়ের তলার মাটি চোরাবালির রূপ নেবে। পারুলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা না যাক, তবু এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের

ভাল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। অবলুপ্তির জন্য পারুলের কোন ক্ষোভ নেই।

শুধু সামান্য একটা চিন্তা। কলকাতায় পারুলের বাপের বাড়ী। থিয়েটার দেখার বাড়তি বিলাস ও বাড়ীর কারুর নেই, বাড়তি রসদের অভাবে। কিন্তু জোর করে কিছু বলা যায় না! গুজবের দেশ কলকাতা। এধারে ওধারে ছড়ানো ছিটানো বান্ধবীও কম নেই পারুলের। তাদের কেউ আসতেও পারে। তারপর পল্লবিত হয়ে কথাটা ছড়িয়ে পড়বে এধারে ওধারে। বুড়ো বাপের কানে উঠতে আর কতক্ষণ। তারপর!

বিছানার ওপর পারুল উঠে বসল। তারপর, আর কি! স্বামীর ঘর ছেড়ে যে কালি পারুল মুখে লেপেছে, থিয়েটারের রঙ কি তার চেয়েও কালো! মেয়ে বেঁচে নেই, এই কথাই নিশ্চয় পারুলের বাবা রটিয়েছেন চারদিকে। কাজেই কুলটা মেয়ে যদি নটি হয়েই থাকে, সে কথা পারুলের বাবা স্বীকারও করবেন না।

পারুল রাজী। থিয়েটারের নাম করতে পারুক না পারুক, আর একটা পুরুষকে আশ্রয় করে নৌকা তো ভাসাক। কূল পায় তো ভালোই, নয়তো ঢেউয়ের মাথায় মাথায় উদ্দাম জীবন, তাই বা মন্দ কি!

দিন তিন চার নয়, সাতেক সময় নিল। একদল যাত্রী হরিদ্বারের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল, অমিয়নাথ মাকে তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিল। হরিদ্বার শেষ করে বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা পর্যন্ত। অন্ততঃ মাস তিনেক সময় নেবেই। এক এক জায়গায় দিন পনেরো কিংবা ভাল লাগলে তারও বেশী।

যা ভেবেছিল পারুল, তা নয়। চেহারা দেখে মনে হয়েছিল অঢেল সম্পত্তির মালিক। থিয়েটারে নাটক লেখা কেবল শখ। কিন্তু

বাড়িঘরের চেহারা দেখে পারুলের ধারণা বদলাল। আড়াই খানা ঘর, সামনে ফালি বারান্দা। ওরই মধ্যে গোটা তিনেক টব। বেল, জুঁই আর রজনীগন্ধা। ওই গাছই—ফুলের সঙ্গে খোঁজ নেই। ট্যাকের তেমন জোর নেই বটে অমিয়নাথের কিন্তু শখ আছে ষোল আনা। দিন তিনেকের মধ্যেই টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে এল পারুলের জন্য। রংদার শাড়ী, জানালার বাহারে পর্দা, ব্লাউজের ছিট।

ঘর গোছাতে গোছাতে পারুল হাসল, মাকে কি বলে সরালেন? তক্তপোশের ওপর উপুড় হয়ে অমিয়নাথ নিজের শার্ট ইস্ত্রি করছিল, কাজ থামিয়ে বলল, আপনার জন্য এই প্রথম মার কাছে মিথ্যে কথা বলতে হল। বললাম, থিয়েটার থেকে জরুরী চিঠি এসেছে, একটা বই চাই দিন দশেকের মধ্যে, তাই কলকাতায় যেতে হবে।

—বানিয়ে বানিয়ে লেখেন বলে বানিয়ে কথা বলতেও বুঝি একটু বাঁধে না। নিয়ে তো তুললেন, মা ফিরলে কি হবে?

এবার অমিয়নাথ হাসল, মাকে খুশী করার ভার আপনার ওপর।

এ কথার কোন উত্তর দিল না পারুল। উত্তর দেওয়ার বিপদ আছে। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কালভুজঙ্গই ফণা তুলবে শেষে। হালকা পরিহাসের সুর খসে কান্নার ছোঁয়া লাগবে। বাড়ীর বৌ নাকি পারুল যে অমিয়নাথের মাকে বশ করবে সেবা যত্নে। এখনও হাতে তিনমাস সময়, এর মধ্যেই তাকে থিয়েটারে অমিয়নাথ চালান দেবে এ কথা পারুলের জানা। তবু যতক্ষণ একটা মানুষের সংসারে আছে, দুহাতে ঘর গুছোবে, সেবা যত্নের কোন ত্রুটি করবে না।

বাড়ীর বাইরে যাবার নাম নেই অমিয়নাথের, কোন রকমে সকালে বাজারটা সেরে এসে তক্তপোশের ওপর উঠে বসে। সামনে বইপত্রের স্তূপ। ঘাড় গুঁজে একটানা লিখে চলে। মাঝে মাঝে চীৎকার করে ওঠে, পারুল, পারুল!

হলুদের ছোপ লাগা হাত দুটো শাড়ীতে মুছতে মুছতে পারুল এসে দাঁড়ায়। কি ব্যাপার, এমন চেঁচাচ্ছেন কেন?

সাধে চেঁচাচ্ছি, অমিয়নাথ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, বাতাসে পাতা ছড়িয়ে গেল চারদিকে। ওই দেখ একটা বারান্দার রেলিংয়ে, এখনি বাইরে গিয়ে পড়বে। শীগ্‌গির ধর।

'আপনি' থেকে পারুলই 'তুমি'তে নামিয়েছে। এক ঘরে বাস। নড়তে চড়তে হাজারবার মুখোমুখি, তা ছাড়া হিসাব করে দেখেছে পারুলের চেয়ে অমিয়নাথ বছর চারেকের বড়ই হবে।

আসন পেতে ভাতের থালা সামনে রেখে পাখা হাতে পারুল পাশে বসল। অমিয়নাথ আসনে বসতেই মুখ টিপে হেসে বলল একটা কথা ছিল।

ভাতের গ্রাস মুখে দিতে অমিয়নাথ সামনে ঝুঁকেছিল; পারুলের কথায় সোজা হয়ে বসল, বলে ফেল।

—কি জাত, কোথাকার মেয়ে কিছুই খোঁজ নিলেন না, অথচ রান্নাঘরের ভার তুলে দিলেন হাতে, রান্নাও খেয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন।

অমিয়নাথ মুচকি হাসল, মেয়েমানুষ হচ্ছে রাঁধুনির জাত। তাদের সম্বন্ধে আর কিছু খোঁজ নেবার দরকার হয় না।

—বেশ তা নয় হল, জাত-বেজাত কিছুই মানেন না আপনি। কিন্তু দুদিন পরে তো থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে তুলবেন আমাকে, তখন হাত পুড়িয়ে খেতে হবে তো?

—মাথা খারাপ, অমিয়নাথ মাথা নাড়ল, তোমায় নিয়ে যাচ্ছে কে থিয়েটারে? এ কদিনে আমাকে যা আয়েসী করে তুলেছ, নিজের হাতে রান্না করা আর আমার পোষাবে না।

কথার সঙ্গে সঙ্গে অমিয়নাথ মুখ তুলতেই পারুল অবাক। সারা মুখ আরক্ত। দুচোখ জলে টলটল।

এ কদিনে এক বাড়িতে থাকলেও অমিয়নাথ সীমা ছাড়ায় নি।

সংসারের কাজ কর্ম করার অবসরে পারুল চোখ তুলে দেখেছে। একদৃষ্টে অমিয়নাথ চেয়ে রয়েছে। কিন্তু সে চাউনি দেহের ওপর নয়, দেহ ভেদ করে আরও গভীরে সে দৃষ্টির লক্ষ্য। আচারে আচরণে কোনদিন বেহিসেবি হয় নি অমিয়নাথ। সান্নিধ্যের সুযোগ নিয়ে এগিয়ে আসে নি।

পারুলের বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। আবার কেন ঘর বাঁধার প্রলোভন? পথে পথে ঘুরে-বেড়ানো মেয়েকে আঙিনায় বসতে বলা। ক্ষণিক সুখের লোভ দেখানর কোন মানে হয় না। ছায়া সরে যাবে মাথার ওপর থেকে। আবার সেই দেহ ঝলসানো রোদ, উত্তপ্ত বাতাসে জ্বালা ধরাবে চোখে, উপল-বিষম অনুর্বর পথে বার বার হোঁচট লাগবে।

—মাকে কি বলবেন? উটকো মেয়েকে ঘরে এনে তোলার কি কৈফিয়ৎ দেবেন?

খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে অমিয়নাথ বলল, উটকো একটা মেয়েকে ঘরে আনার সাধ মার অনেক দিন থেকে। সে আশাই না হয় মেটাব।

কথা শেষ করেই অমিয়নাথ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু অত সহজে পারুল উঠতে পারল না। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা। চোখের সামনে অন্ধকারের তরল স্রোত। এত দিনের সংযত অমিয়নাথ এক মুহূর্তে কেমন করে এমন বেহিসেবি হয়ে উঠল। সব খোয়ানো মেয়ের সামনে কেন তুলে ধরল সংসারের জলজ্বলে ছবি!

বিকালের দিকে অমিয়নাথ একটু বাইরে বেরিয়েছিল, সন্ধ্যার ঝোঁকে চাতালে পা দিয়েই অবাক।

ফুলগাছের পাশাপাশি এক টবে, কোথা থেকে পারুল তুলসীর চারা যোগাড় করেছে। গলায় আঁচল, হাতে প্রদীপ। দু' পায়ে আলতার

ছোপ। হেঁট হয়ে প্রণাম করে উঠতেই পিছন থেকে অমিয়নাথ বলল, দেবী আমি তুষ্ট। বর গ্রহণ কর।

পারুল কোন উত্তর দিল না। প্রদীপ তুলসীতলায় রেখে নিচু হয়ে অমিয়নাথকে প্রণাম করল পা ছুঁয়ে।

যাযাবরী জীবনের অন্তরালে কল্যাণী মূর্তি কোথায় লুকানো ছিল কে জানে। পারুলের অন্তরের কামনাই বুঝি রূপ নিল। গৃহদেবতার সঙ্গে গৃহস্বামীর এমন মিল পারুলের জীবনে আর ঘটেনি। নয়তো তুলসী চারা তো সেকেণ্ড মাস্টারের উঠানেও ছিল, মাটির প্রদীপের অভাব হত না, আলতা সিঁদুরেরও নয়।

অমিয়নাথ দুহাত ধরে পারুলকে বুকের কাছে টেনে নিল, স্টেজে এমন একটা দৃশ্য দেখাতে পারলে হাজার দর্শকের তারিফ পেতে, এখানে দর্শক আমি একলা, কিন্তু বিশ্বাস কর এমন গুণী দর্শক তুমি কোথাও পাবে না।

কল্পিত অভিমানে পারুল ঠোঁট ফোলাল, ওঃ, তার মানে আমি বুঝি অভিনয় করছি।

অমিয়নাথ হেসে উঠল, জানো না, পৃথিবী একটা রঙ্গমঞ্চ, সকলেই আমরা অভিনয় করে চলেছি।

দিন কতক অমিয়নাথ খুব ভোরে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। দুপুরে দু' মুঠো মুখে দিয়ে আবার বাইরে। বাড়ী ফিরতে রাত দশটা। মুখ গম্ভীর, ঠোঁটে হাসির ছলনা।

পারুল ঘরপোড়া গরু। সামান্য এদিক ওদিক হলেই বুক দুর দুর করে।

তোমার কি হয়েছে বল তো? থমথমে মুখ, কথা বলছ না ভাল করে?

—কি আর হবে? কিছু নয়। টুসকি দিয়ে শরীর থেকে জল ঝরিয়ে ফেলার ভান করল অমিয়নাথ।

কিন্তু একদিন সব আবরণ খসে পড়ল।

সকালের রান্না শেষ করে পারুল ঘরে ঢুকে দেখল চৌকাঠে অমিয়নাথ চুপচাপ বসে রয়েছে দু' হাতে কপাল টিপে।

—কি হল শরীর খারাপ নাকি?

অমিয়নাথ মাথা নাড়ল।

—তবে?

অমিয়নাথ ফিরে চাইল, বড় মুস্কিলে পড়েছি।

—কি মুস্কিল? পারুল পাশে বসে পড়ল গায়ে গা ঠেকিয়ে।

একটু একটু করে অমিয়নাথ সব বলল। একটা একটা করে বেদানার দানা ছাড়ানর মতন।

'বাণীপীঠের' বাঁধা লেখক। যা কিছু নাটকের দরকার সবই অমিয়নাথ লিখে দিত। কিন্তু কর্মকর্তারা নতুন আর একজন নিয়েছেন। অমিয়নাথের বাইরে থাকার সময়। আগে যাত্রার পালা লিখত। অক্রুর সংবাদ, কুব্জার বিলাপ, মানভঞ্জন। এবার থিয়েটারের নাটকে হাত দিয়েছে। জয়পরাজয়। তারই মহড়া চলেছে। সেই জন্যই এত কষ্টে এতদিন ধরে লেখা নিজের বইটা বগলে করে অমিয়নাথকে ফিরে আসতে হয়েছে। এখন মাস কয়েক নতুন বইয়ের দরকার নেই। বেশ কিছুদিন পরে এসে দেখা করতে পারে। নয়তো বইটা একবার রেখে যেতে পারে। সময় হলে খবর দেওয়া হবে।

থিয়েটারের হালচাল অমিয়নাথের ভালই জানা আছে। বই রেখে গেলে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না কিছুদিন পর। বারোভূতের ব্যাপার, কে কার খোঁজ রাখে।

এধার ওধার ঘোরাঘুরি করেছে। 'রঙ্গমায়া'র দরজা বন্ধ, থিয়েটারে লোকসান, তাই মেরামত চলেছে। চিত্রগৃহে রূপান্তরিত হবে। 'মধুমহল'-এর ম্যানেজার সোজা কথা বলেছে। ওসব আধুনিক

লেখক তাদের চলবে না। পুরানো বই গাদা খানেক জমে আছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বছর খানেক তাই চালাবে। 'মঞ্চলোক'এর মালিকরা অন্য কথা বলল। অমিয়নাথের নাম তাদের খুব জানা, তবে কথা হচ্ছে থিয়েটারের মুমূর্ষু অবস্থা। কোন রকমে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। এ সময়ে বাড়তি খরচ করে নতুন বই নেওয়া সম্ভব নয়, তবে বইটা যদি দাঁড়িয়ে যায়, অমিয়নাথকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করবে।

অমিয়নাথ আর দাঁড়ায় নি। বই নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে। কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটে নি। জমানো টাকা প্রায় শেষ। আশা ছিল, বইটা দিয়ে আগাম কিছু আনতে পারবে। অন্ততঃ মাস দুই তিনের জন্য নিশ্চিন্ত। নৌকার তলা ফুটো, অবিরত জল উঠছে। বেসামাল মাঝির মতন অমিয়নাথের অবস্থা কাহিল।

—এই কথা, পারুল ঠোঁটে হাসি ফোটাল, দু চোখে বরাভয়ের আভাস, ঠিক আছে, আমার সামান্য যা গয়নাগাঁটি আছে তাই দিয়েই চালাও। তার মধ্যেই তোমার কিছু একটা হয়ে যাবে।

মুখে পারুল এত কথা বলল বটে, কিন্তু মনে মনে সত্যিই ভাবনায় পড়ল। ভারি তো গয়না, বেশীর ভাগ শেষই হয়ে গেছে। এত বছর ধরে তাই ভাঙিয়ে পারুলের চলছিল। ছিটে ফোঁটাই পড়ে আছে। পুরানো আমলের গয়না। নাকের নথ আর সোনার কাঁটা। আংটি আর চুড়ি গোটা কয়েক। এ দিয়ে আর কতদিন চলবে। তবু ডুবন্ত মানুষের কাছে কুটোর দামও কম নয়।

অমিয়নাথ মাথা নাড়ল, তা কখনও হতে পারে। একটি রাংতা তোমায় দিতে পারি নি হাত তুলে, আর বসে বসে তোমার সোনার গয়নাগুলো নষ্ট করব!

পারুল অমিয়নাথের আরো কাছে সরে এল। দু হাতে একটা

হাত আঁকড়ে ধরল। বলল, সময় ভাল হলে তুমিই আবার গড়িয়ে দেবে আমাকে। অত ভাবনার কি আছে। আমি বুঝি তোমার পর।

না, পর হয় তো নয়। পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসা উটকো মেয়ে, কিন্তু এই কদিন সংসার করে সত্যি খুব কাছাকাছি সরে এসেছে দুজনে। চাল-চলনে মনে হয় যেন ছাঁদনাতলা থেকে আলাপ।

অমিয়নাথ রাজী হল। অবশ্য এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। উপোস করে শুকিয়ে মরার চেয়ে এ হাজার গুণে ভাল। কিছুদিন তো চলুক, এর মধ্যে অমিয়নাথও চেষ্টা করবে। আরো একটা বই লিখে ফেলবে এই কদিনে। দরজায় দরজায় ঘুরবে, কোথাও বইটা লেগে গেলেই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

এ কদিনে অমিয়নাথ বই একটা লিখল বটে, ঐতিহাসিক নাটক, নাচ-গান জমজমাট কাহিনী, কিন্তু বরাত, কোথাও সুবিধা হল না। এত খরচ করে বই নামাতে কেউ রাজী নয়, তা ছাড়া ঐতিহাসিক বইয়ের আর নাকি চলন নেই।

টেনে টুনে আরো মাস দুয়েক। শুধু পারুলের সোনার টুকরোই নয়, অমিয় াথের আংটি, ঘড়ি, বোতাম, সব উধাও। মুদীর তাগাদায় অমিয়নাথ বাড়ী ছাড়া, তাতেও কি নিস্তার আছে। পাওনাদারের দল যেন ওৎ পেতে থাকে। অমিয়নাথকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে চারদিক থেকে।

খবর জোগাড় হল 'বাণীপীঠ' থেকেই, বইয়ের দরকার নেই, হাতে মেয়ে আছে অমিয়নাথের? সিনেমার দাপটে থিয়েটারের দিকে কেউ পাও ফেরায় না। নিতান্ত যাদের কোন চুলোয় ঠাঁই নেই, তারাই পায়ে পায়ে এ লাইনে এসে জটলা করে। কিন্তু তাদের দিয়ে কিছু হবার নয়। চেহারা দেখলেই দর্শক ভিরমি যাবে,

মুখ খুললে তো কথাই নেই। ভাল মেয়ে আছে অমিয়নাথের সন্ধানে? চলনসই হলেই হবে, মোশন-মাস্টার রয়েছে ঠিক গড়ে পিটে নেবে।

অমিয়নাথ মাথা চুলকাতে শুরু করল। তারপর ঘাড় নাড়ল। উঁহু, তেমন মেয়ে আর কই। বিরাট জাল পেতে রেখেছে সিনেমাওয়ালারা, রাঘব বোয়ালের তো কথাই নেই, চুনো পুঁটি পর্যন্ত ডাঙ্গায় তুলছে। বোবা মেয়ে অবধি তরে যাচ্ছে তাদের কল্যাণে।

সারা রাত অমিয়নাথ ছটফট করল। পকেটে একটি আধলাও নেই, ভোরে উঠে বাজার যাবার সমস্যা রয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখল তাকে। মনে মনে হাজার বার গড়ল, ভাঙল তার চেয়েও বেশী বার। সঙ্কোচের আগল, দ্বিধা আর সংশয়ের মিশেল, কথাটা কি করে বলবে পারুলকে! কোন্ লজ্জার মাথা খেয়ে। কিসের অসুবিধা। ঘর বাঁধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তো পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসে নি তাকে, এক সঙ্গে সংসার পাতবো এমন অলীক আশ্বাসও দেয় নি! তবে? থিয়েটারে ঢুকিয়ে দেব এই কথাই তো হয়েছিল!

সকালের ভোজ মুড়ি আর চা। পাশাপাশি বসে খেতে খেতে পারুলই জিজ্ঞাসা করল, কাল 'বাণীপীঠে' গিয়েছিলে নাকি? কিছু হল?

অমিয়নাথ শুকনো হাসল, এখনও দুঃসময় কাটে নি। ঠিকুজি কোষ্টিটা নিয়ে মোড়ের জ্যোতিষার্ণবের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

—কেবল হেঁয়ালী, বল না কি হল?

—ওরা এখন নতুন বই চায় না, নতুন বৌ চায়।

—নতুন বৌ?

—মানে নতুন মেয়ে আর কি। জোগান দিতে পারলে কিছু রোজগার হয়।

হাসতে গিয়েও পারুল কি ভেবে থেমে গেল। এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে মুড়ির থালা, দ্রুতপায়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

আবার যখন পারুল অমিয়নাথের মুখোমুখি দাঁড়াল, তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। তক্তপোশে বসে অমিয়নাথ পুরানো লেখাটা কাটাকুটি করছিল। বলা যায় না, কোনদিন হয় তো 'বাণীপীঠ' চেয়েও বসতে পারে বইটা। আগের দিনের মতন বন্দোবস্ত। প্রথম কয়েক রাত্রি পাঁচ টাকা করে তারপর থেকে তিন টাকা।

শাড়ীর খসখস আওয়াজে অমিয়নাথ মুখ তুলল, কি খবর? কথা বলেই কিন্তু অমিয়নাথ অবাক। মেঘ-থমথম মুখ পারুলের। দুটো চোখ ফোলা, কাগজ-সাদা ঠোঁট।

—একটা কথা ছিল। গলার আওয়াজ গুরুগম্ভীর।

বইয়ের পাতা গুছিয়ে অমিয়নাথ ঠিক হয়ে বসল। বলল, বলে ফেল। অখণ্ড অবসর। একটা কেন একশটা কথা শুনতে পারি।

পারুল রসিকতার ধার দিয়েও গেল না। একটু এগিয়ে তক্তপোশের একটা কোণে বসে বলল, আমার ব্যবস্থা তুমি কি করলে?

পথের মেয়েকে রথের দেবী করেছি—এমন একটা কথা বলতে গিয়েও অমিয়নাথ থেমে গেল। আবহাওয়া অনুকূল নয়। হালকা পরিহাস না করাই ভাল।

—নিরন্ন সংসারের অন্নপূর্ণা করেছি, আর কি চাও? অমিয়নাথ হাসি ফোটাল ঠোঁটে।

—না, রসিকতা নয়! আমায় তুমি কিসের লোভ দেখিয়ে এনেছিলে মনে আছে? এমন করে সারাটা জীবন বুঝি হাঁড়ি ঠেলব তোমার? হেঁসেলে জীবন কাটাব?

হাত দুয়েক দূরে বাজ পড়লেও অমিয়নাথ এত চমকাত না। আবোল তাবোল একি বকছে পারুল। হঠাৎ কি হল? ঘরের বৌকেও লোকে এত যত্নে রাখে না। শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত অমিয়নাথ সংসারে ঢেলেছে। আজ সংসারের টলমলে অবস্থা, কানা বেয়ে জল উঠছে চারদিক থেকে, মাঝ দরিয়ায় এমন করে হাল ছেড়ে দেবে মানুষ, ঠিক এমনি সময়ে!

—আমার এ জীবন আর ভাল লাগছে না। তোমার সংসার তুমি বুঝে নিয়ে আমায় নিষ্কৃতি দাও। মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে তুমি এতদিন আমায় আটকে রেখেছ।

অমিয়নাথ পারুলের আপাদমস্তক দেখল। কোথাও একটু কোমলতার আভাস নেই, ঋজু এক রেখা। নিষ্করুণ।

—বেশ, তৈরি থেকো, আজ বিকালেই তোমাকে 'বাণীপীঠ'এ নিয়ে যাব। আমি পরিচয় করিয়ে দেব, তারপর তোমার অদৃষ্ট তুমি গড়ে তুলো।

সাবধানে পা বাড়িয়ে অমিয়নাথ তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ল। নিশ্বাস চাপতে চাপতে বলল, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম পারুল। ভেবেছিলাম তুলসীতলার প্রদীপ হতে পেলেই বুঝি তুমি সুখী হবে, ভাবিনি আকাশের হাউই হবার সাধ তোমার। তোমাকে আটকাতে গেলে শুধু হাতই পুড়বে, তোমাকে রাখা যাবে না।

পাশের ঘরে অমিয়নাথের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তক্তপোশের ওপর পারুল আছড়ে পড়ল। ফুলে ফুলে অঝোরে কান্না।

এত বোকা কেন পুরুষ জাত! বাইরের বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানটাই কেবল তাদের নজরে ঠেকে, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া অন্তরের দিকে বুঝি কিছুতেই চোখ ফেরাবে না। দূরে যাওয়া মানেই হারিয়ে যাওয়া নয়, কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেও বুঝবে না অমিয়নাথ।

চুলে কলপ, বাজপাখী প্যাটার্ন বাঁকানো নাক, খুদে চোখ কিন্তু চাউনি ধারালো ; ঝুলে পড়া ঠোঁট। দুহাতে আটটা আংটি। পলা, পান্না থেকে গোমেধ। কখন কোন গ্রহ রুষ্ট হয় বলা মুস্কিল। কোঁচানো ধুতি, গায়ে ঝলঝলে পাঞ্জাবি।

পারুল ঢুকতেই হরগোবিন্দবাবু হাত থেকে গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রাখলেন। ঘর খালি। এখন লোকজন আসার সময়ও নয়। আপাদ-মস্তক দেখলেন চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে। চেহারা তো নিন্দার নয়। আটসাঁট গড়ন, বাড়ন্ত পুঁইডগার মতন চিকচিকে ভাবও একটা আছে। কিন্তু হয়তো ওই চেহারা সর্বস্ব। মুখ দিয়ে একটি কথা বলাতে গেলেই দাঁতকপাটি, হল ভর্তি মানুষের সামনে দাঁড়াতে হলেই মূর্ছা।

পারুলকে ডিঙিয়ে হরগোবিন্দবাবু অমিয়নাথের দিকে তাকালেন।

—তারপর অমিয়নাথ, কি খবর বল ?

অমিয়নাথ চৌকাঠের কাছ বরাবর দাঁড়িয়েছিল, এবার ঘরের মধ্যে এল। হরগোবিন্দবাবুর সামনে এসে মুচকি হাসির ভান করে বলল, খবর তো আপনার সামনে এনে হাজির করেছি স্যর।

আর একবার হরগোবিন্দবাবু পারুলের দিকে চাইলেন। জরীপ করার ভঙ্গীতে চোখ কুঁচকে দেখলেন তারপর অমিয়নাথের দিকে ফিরে বললেন, কি নাম ?

অমিয়নাথ নয়, পারুলই বলল নাম।

—এ লাইনে আগে এসেছিলে কখন ? মানে অভিনয়-টভিনয় করেছিলে এর আগে ?

অভিনয় যে করেনি তা হরগোবিন্দবাবুর জানা। এ ব্যবসায় আজ ত্রিশ বছরের ওপর রয়েছেন। একনজরে সব বলে দিতে পারেন। শুধু পারুলের গলার আওয়াজটা পরখ করতে চেয়েছিলেন। মিহি না মোটা, মিষ্টি না কর্কশ।

পায়ের নখ দিয়ে পারুল মেঝে আঁচড়াল। থেমে থেমে বলল, না এ লাইনে কোনদিন ছিলাম না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি পারব। ঠিক পারব।

এ আত্মপ্রত্যয়টুকু হরগোবিন্দবাবুর খুব ভাল লাগল। এর দাম আছে। নিজের চোখে দেখেছেন। শাড়ী জড়ানো জড়ভরত মেয়ে, জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁটে, যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতেই ঘায়েল, কিন্তু মনের জোরে ঠিক উৎরে গেছে। চাকরাণী থেকে রাজরাণী, বাঁদী থেকে বেগম। ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছে।

—একটু বস। মোশনমাস্টার এসে পড়বে এখনি। দু একটা লাইন আওড়ালেই বুঝতে পারব।

হরগোবিন্দবাবু কথা শেষ করবার আগেই সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। হাসির আওয়াজ। শাড়ীর আঁচলে মুখ মুছে পারুল ঠিক হয়ে বসল।

দুটি ভদ্রলোক, পিছনে একটি মেয়ে।

হরগোবিন্দবাবু মেয়েটির দিকে চাইলেন, কটা বেজেছে খেয়াল আছে?

মেয়েটি নাকিস্বরে উত্তর দিল, আমি কি করব, আমি তো বেলা দুটো থেকে রেডি। ওই মাস্টার মশায়ের কাণ্ড। ম্যাটিনিতে সিনেমায় নিয়ে গেলেন। বাব্বা, কি বই! মাথা ধরে গেছে।

নাদুস-নুদুস মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি হাসল, তোমরা তো সিনেমা সিনেমা করে পাগল। তাই দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, তবু যদি চোখ ফোটে।

—কি বই মাস্টার? হরগোবিন্দবাবু নল টানার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—ধূসর ধরণী। আমাদের পারিজাত দেবী যে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

—কোন পারিজাত! হরগোবিন্দবাবু ঠিক চিনতে পারলেন না। ঝাঁক ঝাঁক পায়রা উড়ে এসে বসেছে। কেউ মাসখানেক থেকেছে, কেউ বা আবার বছরের পর বছর। নানা রংয়ের, নানা জাতের। সকলকে মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু সিনেমায় নায়িকার পার্ট করছে এমন মেয়েকে তো মনে থাকবার কথা।

—কে? বল দেখি মাস্টার? আমার তো ঠিক ঠাওর হচ্ছে না।

মোশন মাস্টার হেসে উঠল ভুঁড়ি দুলিয়ে।

—আরে আপনি চিনবেনই বা কেমন করে। আমার বলাই অন্যায় হয়েছে। এখানে তো নাম ছিল পাঁচী।

পাঁচী! হরগোবিন্দবাবু একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল। প্যাকাটি প্যাকাটি চেহারা। হাতে মাদুলির বোঝা। মেদিনীপুর না কোথা থেকে এসেছিল। মাসের মধ্যে দশদিন ম্যালেরিয়ায় কোঁ কোঁ করত। একদিন তো স্টেজে নাদিরার পার্ট করতে করতেই জ্বর এসে গেল। সে কি কাণ্ড। লোকেরা হৈচৈ চেঁচামেচি করাতে ড্রপই ফেলে দিতে হল। সেই পাঁচী পারিজাত হয়েছে সিনেমায়। সর্বনাশ। মেয়েটার গলাটা ভাল ছিল। টিঁকে থাকলে একদিন ভালই হত। কিন্তু সিনেমা, থাকতে দিলে তো! পাঁচী পারিজাত হচ্ছে, পদ্দি-পদ্মিনী। হরদম।

—যাক, গড়গড়ার নলটা হরগোবিন্দবাবু ছেড়ে দিলেন, যার যা ইচ্ছা করুক। মাস্টার, এই একটি মেয়ে অমিয়নাথ এনেছে, দেখ দেখি পরখ করে।

—চেহারা তো মন্দ নয়, নস্য নাকে দিতে দিতে মোশন মাস্টার বলল, এখন রাঙা পলাশ না হলেই বাঁচি।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা বই বের করে, পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় থামল, নাও দেখি ওঠ, একটা লাইন বল দেখি। শানুবাবু আপনিও উঠুন।

—আবার আমাকে কেন? ভদ্রলোক ঘাড় মোড়া ভাঙল। হাই তুলল একবার, তারপর ভ্রূ দুটো কায়দা-মাফিক তুলে জিজ্ঞেস করল, কোনখানটা?

—ওই যে শম্বুক হত্যার সিনটা। আপনি রামের প্রক্সিটা দিন। আর তুমি তুঙ্গভদ্রা। স্বামীকে হত্যা করবার জন্য অভিশাপ দিচ্ছ রামচন্দ্রকে।

মোশন মাস্টারের কথা শুনে শুনে পারুল বলে গেল। ভয়কম্পিত গলার স্বর। চড়াতে গিয়ে পারল না। কিন্তু তাতেই কাজ হল। হরগোবিন্দবাবু কানের দুপাশে দুটো হাত রেখে শুনলেন। উটপাখীর মতন গলা বাড়িয়ে।

মোশন মাস্টার তারিফ করল, অবশ্য খুব উচ্ছ্বসিত না হয়ে, গলা ভাল, তবে আরো মাজা-ঘষা করতে হবে। একটু ফ্ল্যাট, ওঠানামা নেই গলার।

—মাস্টার, হরগোবিন্দবাবু কথা বললেন, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। হাতে সময়ও তো আর বেশী নেই।

পারুল বহাল হল। মাইনেপত্র সব কিছু অমিয়নাথই ঠিক করবে। কথা হবে হরগোবিন্দবাবুর সঙ্গে। দিন সাতেক পর থেকেই মহলা শুরু হবে।

ঘোড়ার গাড়ীতেই দুজনে ফিরল। অমিয়নাথ আর পারুল।

বাড়ীর দরজায় নেমেই অমিয়নাথ পিছিয়ে এল। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওপরের বারান্দায় মোটঘাট। বাক্স, বিছানা। তারই একটার ওপর অমিয়নাথের মা বসে।

—সর্বনাশ, মা ফিরে এসেছেন।

পারুল পা ঝুলিয়ে নামতে যাচ্ছিল, অমিয়নাথের কথায় গুটিয়ে নিল নিজেকে।

—উপায় ? ফিসফিসিয়ে অমিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করল।

উপায়! ভেবে কূলকিনারা পেল না। একমাত্র উপায় বাণীপীঠে ফিরে যাওয়া। হরগোবিন্দবাবুকে বলে ওখানেই থাকার বন্দোবস্ত করা। ঘর আছে অবশ্য গোটা দুয়েক। আগের দিনে দুএকজন অভিনেত্রী থাকত, কিন্তু পারুলের হয়ত অসুবিধা হবে।

কথাটা পারুলকে বলতেই সে মাথা নাড়ল, হলই বা একটু অসুবিধা, তার আর উপায় কি ? অমিয়নাথের বাড়ীতে গিয়ে ওঠবার পথ তো বন্ধ। কি পরিচয় দেবে অমিয়নাথ মায়ের কাছে ? কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির থেকে এটিকে সংগ্রহ করেছি। জাত জানি না, পরিচয় জানি না, হেঁসেলের ভার তুলে দিয়েছি হাতে, খেলাঘরের সংসারে বৌ বৌ খেলার মতন ঘর করছি একে নিয়ে।

মাসখানেক, তার মধ্যেই পারুল অনেকটা তৈরি হয়ে নিল। আর দাঁড়ালে তেমন পা কাঁপে না, গলার আওয়াজেও কোন জড়তা নেই। পার্টও বেশ মুখস্থ হয়ে এসেছে।

মাঝে মাঝে রিহার্সালে অমিয়নাথ থাকে। মহলার শেষে ঘর-সংসারের কথা হয়। অমিয়নাথ বলে, পারুল শোনে।

—জান, অমিয়নাথ মুখ টিপে হাসল, মা খুব ধরেছে।

পারুল বুঝল, কিন্তু না বোঝার ভান করল।

—কি ব্যাপার ?

—মানে, দক্ষিণেশ্বরে কাকে দেখে মার খুব পছন্দ হয়েছে, সেখানে পাকা কথা দিতে চায়।

—বা, এতো সুখবর। রাজী হয়ে গেছ নিশ্চয় ?

—হুঁ, অমিয়নাথ ঘাড় নাড়ল মাথা নিচু করে, নিজেরই অন্ন জুটছে না, আবার লোক বাড়াবো।

পারুলের বুকের মাঝখানটা ধক করে উঠল। জ্বালা করে উঠল

চোখ দুটো। শুধু টাকা পয়সার কথাটাই অমিয়নাথের মনে পড়ল। বাড়তি একটা মুখের গ্রাস জোটাবে কোথা থেকে! এ কথা একবারও বলল না, এতদিন ঘর করেছে পারুলকে নিয়ে, অন্য কাউকে সে জায়গায় বসাতে মন চাইছে না। শুধু পারুলের মুখ চেয়েও তো বলতে পারত এমন একটা কথা।

অমিয়নাথ চলে যাবার পর পারুল বারান্দায় হেলান দিয়ে অনেক-ক্ষণ বসে রইল। এখনো বাতি জ্বালান হয়নি। সিঁড়ির খাঁজে খাঁজে জমাট অন্ধকার। অনেকটা ওর অনাগত জীবনের মতই। শ্যাওলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছে। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে। মাটির আশ্রয় নেই, জীবনের বাঁধন নয়, ঢেউয়ের তালে তালে শুধু ভেসে যাওয়া। দুহাত দিয়ে যখনই যাকে আঁকড়ে ধরতে গেছে, সেই ছিটকে সরে গেছে। এ ঘরবাঁধার খেলায় হার হয়েছে পারুলের। জীবনে অসহ ক্লান্তি, মরারও সাহস নেই। কিন্তু কতদিন কাটাবে এই জীবন্মৃত অবস্থায়!

বারান্দায় আঁচল পেতে পারুল শুয়ে পড়ল। অনেকগুলো পায়ের শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল। উঠে বসল ধড়মড়িয়ে।

হরগোবিন্দবাবুর গলা, কই গো, কোথায় গেলে? ঘরদোর অন্ধকার কেন। বাতিটা জ্বালাও।

বেসামাল কাপড় ঠিক করে পারুল সুইচ টিপে দিল।

প্রথমে হরগোবিন্দবাবু, পিছন পিছন দুজন কুলি একটা তক্তপোশ বয়ে আনছে।

—মেঝেয় শোয়াটা ঠিক নয় এ সময়ে। ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগে গেলেই সর্বনাশ। গলা ধরে যাবে, ছিটে ফোঁটা আওয়াজ বের হবে না গলা দিয়ে।

হরগোবিন্দবাবুর নির্দেশে তক্তপোশ ঘরের মধ্যে পাতা হল। দেয়াল ঘেঁসে। হরগোবিন্দবাবু কুলিদের বিদায় দিয়ে তক্তপোশের ওপর বসলেন।

—বেশ মন দিয়ে শেখো। এ লাইনে নাম করতে পারলে পয়সার অভাব থাকবে না। সিনেমার লোকেদের একেবারে পাত্তা দেবে না। বুঝলে? ওরা এক একটি মাথা বিগড়োবার যম।

হরগোবিন্দবাবু গলার স্বর পালটালেন।

—এখানেই থেকে যাও। কোন অসুবিধা হলে আমাকে বল। আমি মাঝে মাঝে আসব এখন। এই নাও।

হরগোবিন্দবাবু হাত প্রসারিত করে দিলেন। হাতে দশ টাকার নোট।

—নাও, রেখে দাও। খাওয়া দাওয়ার খরচ তো আছে। ভগবানের ইচ্ছায় পুজোর সময় বইটা যদি জমে যায় তা হলে আর দেখতে হবে না। তখন দেখবে হরগোবিন্দর বুকের পাটা। দিতে থুতে একটুও পিছপা নয়।

কথার মাঝখানেই হরগোবিন্দবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন, উঠি আজ। সিন টিন দু একখানা আঁকাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। আর বেশী সময় নেই হাতে।

হরগোবিন্দবাবুর বরাত, না পারুলের কপাল বোঝা গেল না। মাস কয়েকের মধ্যেই অবস্থা পালটে গেল। পারুল থেকে পলি। ওরই নাম দিয়ে বাণীপীঠের বিজ্ঞাপন শুরু। ফুলের তোড়া, হাততালি, কাগজে কাগজে পাতাজোড়া প্রশংসা, মন কেড়ে নেওয়া ঢঙে নিত্য নতুন ফটো!

হরগোবিন্দবাবু আগে সপ্তাহে একদিন আসতেন। খোঁজ খবর নিতে। এখন রোজ বিকেলে আসেন একবার। উপদেশ, পরামর্শ। থিয়েটার ছেড়ে কোনদিন সিনেমার নেশা না পেয়ে বসে সে বিষয়ে সৎযুক্তি।

ধাপে ধাপে পারুল যত উঠেছে ওপরে, আস্তে আস্তে অমিয়নাথ তত সরে গিয়েছে দূরে। মাঝে মাঝে অভিনয়ের শেষে গ্রীণরুমের দরজায় দেখা হয়েছে।

—এখনও যে গালে কপালে রঙ লেগে রয়েছে, অমিয়নাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে।

—ও রঙ নয়, কালি। হাজার ধুলেও উঠবে না। পারুল মৃদু হেসেছে। তারপর তোমার খবর কি ? বিয়ে থা করলে বৌকে একবার দেখালেও না। পারুল ফুলের তোড়াগুলো জড়ো করতে করতে বলেছে।

অমিয়নাথ আর দাঁড়ায় নি। ছলছুতো করে মিশে গেছে ভিড়ের মধ্যে। দিনকতক একেবারে গা-ঢাকা। ধারে কাছে কোথাও দেখা যায় নি।

অমিয়নাথকে দেখা গেল দিন সাতেক পরে। উস্কো খুস্কো চুল। অপরিচ্ছন্ন পোষাক। ম্যাটিনী শো শেষ করে বাইরে আসতেই পারুলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

—কি ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি ? পারুল উৎকণ্ঠিত হল।

এক হাত দিয়ে চুলগুলো অমিয়নাথ মুঠো করে ধরল, তারপর বলল, না শরীর ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—হল কি ? বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে এসেছ নাকি ?

অমিয়নাথ মাথা নাড়ল, এখন নয়, কাল যাব তোমার কাছে। কাল তো প্লে নেই। বাড়িতেই আছ তো ? দ্রুত গলায় অমিয়নাথ কথাগুলো বলে গেল।

—বাড়ীতে থাকব না তো আর যাব কোথায়! পারুল খুব আস্তে বলল।

—ঠিক আছে। কাল দেখা করব। অমিয়নাথ বাইরে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পারুল চুপচাপ্ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। সাড় নেই, চেতনা নেই।

প্রম্পটার নিতাইবাবুর গলার আওয়াজে চমক ভাঙল।

—কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন নাকি? নিতাইবাবু বিনয়ে বিগলিত। দুটো হাত জড়ো করে রাখল বুকের ওপর।

—অপেক্ষা? না অপেক্ষা আর কার জন্য। চলি।

পারুল দ্রুত পায়ে বাইরে চলে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠল খুব আস্তে আস্তে।

খুব বিপদে পড়েছে বোধ হয় অমিয়নাথ। নয়তো ফিটফাট মানুষটা এমন অগোছালভাবে ছুটে আসে! কিন্তু কিসের দরকার!

কি দরকার বুঝতে এত দেরী হল পারুলের! যখন সে অমিয়নাথের বাড়ী ছেড়ে ছিল তখনই তো সংসার-পানসীর টলমলে অবস্থা। দুদিক দিয়ে জল উঠছে! ভার লাঘব করার জন্যই পারুল সরে এসেছিল। কিন্তু তাতেও কি সুরাহা হয়েছে। মা এসে উঠেছেন। নতুন মানুষ সংসারে ঢুকেছে ঘোমটা দিয়ে। একটা মানুষ, কতদিক সামলাবে।

ছি, ছি, কথাটা মনে হতেই পারুল বিছানার ওপর উঠে বসল। বলতে নেই পারুলের অবস্থা ফিরেছে। বাঁধা মাইনে ছাড়াও যখন দরকার হরগোবিন্দবাবু টাকা পয়সা দিয়েছেন। বাড়তি জিনিষপত্র। ইতিমধ্যে 'অজন্তা' থিয়েটার পারুলের পিছনে লেগেছে। মোটা টাকার টোপ। পাঁচ বছরের চুক্তি। হরগোবিন্দবাবু দুটো ডানা দিয়ে পারুলকে আগলে রেখেছেন।

কিন্তু পারুলেরই না হয় অবস্থা ফিরেছে, অমিয়নাথের জন্য সে কি করেছে। দেখা হলে দু একটা মিষ্ট কথা, ব্যস্, এই পর্যন্তই। কোন-দিন ডেকে জিজ্ঞাসা করেনি অভাব অভিযোগের কথা। একটা তামার পয়সাও তার হাতে তুলে দেয় নি।

এতদিন পরে অমিয়নাথ এই কথাই বলতে আসবে। অভাবের তাড়নায় মিথ্যা মর্যাদার আব্রু খসে পড়েছে। লোক-লজ্জার বালাই রাখে নি।

তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি, দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ।

সারা রাত বিছানায় ছটফট করে পারুল ভোরের দিকে একটু চোখ বুজিয়েছে, আচমকা আওয়াজে উঠে বসল।

—কে ?

—হামি দিদিমণি।

হিন্দুস্থানী দরওয়ানের গলার আওয়াজ।

একটা বুড়ী মাইজী দেখা করতে চায়। ভিতরে আসতে বললাম, কিছুতেই রাজী হল না।

বুড়ী মাইজী! একটা কথা মনে হতেই পারুল আঁতকে উঠল। ফ্যাকাসে হয়ে এল মুখ, বিবর্ণ দুটি ঠোঁট। সর্বনাশ, তাই যদি হয়!

বাপের বাড়ী বেলেঘাটা। পথে ঘাটে পোস্টার পড়েছে, ছবিও বেরিয়েছে ছোট খাটো দু একটা কাগজে। বাপের বাড়ীর কারুর নজরে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। খবর পেয়ে মা হয়তো এসে দাঁড়িয়েছে। কূলে কালি দেওয়া মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায়।

—কি বলব দিদিমণি? দরওয়ান মনে করিয়ে দিল।

—কিছু বলতে হবে না। আমি যাচ্ছি। পারুল মন ঠিক করে ফেলল। নাচতে নেমে আর ঘোমটা টানা লাভ কি। নড়বড়ে অজু

রোজগারের সংসারে বাড়তি মানুষ নিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই পারুলের মায়ের, তার চেয়ে বরং অস্বীকার করবে মেয়েকে। প্রাণ খুলে গালিগালাজ করবে। শাপ-শাপান্ত। সেই জন্যই খুঁজে খুঁজে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ভোর না হতে।

মুখ হাত ধুয়ে পারুল নিচে নেমে গেল, আলুথালু চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে। কাল রাতে মাখা রঙের পোঁচ হয়তো রয়েছে গালে, চোখের কোণে কাজলের অস্পষ্ট টান। আঁচল দিয়ে ঘসে ঘসে এ দাগের আর কতটুকু তুলতে পারবে পারুল!

গেটের পাশে একটি প্রৌঢ়া মহিলা। সিক্তবসনা। বোধ হয় গঙ্গা স্নান সেরে ফিরছেন। ইচ্ছা করেই পারুল চটির আওয়াজ করল। প্রৌঢ়া মুখ ফেরালেন। পারুল চমকে উঠল।

অমিয়নাথের মা। কাশীতে দেখেছিল পারুল, সেদিন অমিয়নাথের ঘরের বারান্দায় দেখেছিল কিছুক্ষণের জন্য, ভুল হবার কথা নয়।

—আপনি?

মনে মনে পারুল চিন্তা করল। লজ্জায় অমিয়নাথ নিজে আসতে পারে নি, মাকে পাঠিয়েছে।

—হাঁ বাছা। কোন উপায় না দেখে নিজেই এলাম, তবু যদি তোমার একটু দয়া হয়।

—ভিতরে আসুন না। পারুল শান্ত গলায় অনুরোধ জানাল।

—ওইটুকুই বাকি আছে, প্রৌঢ়ার স্বরে দৃঢ়তার রেশ, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এ বয়সে আর এসব আস্তানায় ঢোকবার প্রবৃত্তি নেই। সেই জন্যই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

পারুলের সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠল। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তবু দম্ভ রয়েছে পুরোমাত্রায়, কৃত্রিম কৌলীন্যবোধ।

—কি আপনার দরকার বলুন, আমার কাজ আছে। পারুল শক্তগলায় বলল।

প্রৌঢ়া হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পারুলের দুটো হাত আঁকড়ে ধরলেন। দুচোখে অশ্রুর বন্যা।

—আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও বাছা। ওই আমার দুঃখিনীর ধন, শিবরাত্রির সলতে। সব গিয়ে ওই টুকুতে ঠেকেছে। আমি তোমার দুহাত ধরে বলছি ওকে রেহাই দাও।

—তার মানে? পারুল সজোরে হাত ছিনিয়ে নিল, কি বলতে চান আপনি?

আঁচল দিয়ে প্রৌঢ়া চোখ মুছলেন। ভাঙা গলায় বললেন, তুমি তো সবই জান। ছেলে থিয়েটারে বই লিখত, বাজার মন্দা। না খেয়ে মরার দাখিল। ব্যাপার দেখে তুমি সরে পড়লে। আমি ফিরে দেখি সংসারের এই অবস্থা। আমার এক দেওরকে ধরাধরি করে এক কারখানায় বহু কষ্টে চাকরি একটা করে দিয়েছি। বলতে নেই, মাইনে পত্র ভালই। প্রৌঢ়া একটু থেমে আবার শুরু করলেন, কদিন ধরে ছেলের বিয়ের চেষ্টা করছি। বলে বলে হয়রান। কেবল হাতে পায়ে ধরা বাকি রেখেছি। কিন্তু কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। অবশ্য কেন যে হচ্ছে না, তা তোমার অজানা নয়। আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, কদিন হল অমিয়নাথ খুলেই বলেছে সব।

—কি বলেছে? পারুল টান হয়ে দাঁড়াল।

—কি যে বলেছে বুঝতেই তো পারছ। বিয়ে যদি করতে হয় তো তোমাকেই করবে। সমাজ মানবে না, আত্মীয়স্বজনের মুখ চাইবে না। দোহাই তোমার, এ বুড়ীর মুখ চেয়ে ও দুধের বাছাকে তুমি ছেড়ে দাও। কত বড় ঘরের ছেলে আসছে তোমার কাছে। কথা শেষ করার আগেই অমিয়নাথের মা আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

দরজা ধরে পারুল টাল সামলাল। বুকের মাঝখানে অসহ্য দাহ। অস্থি মজ্জা সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে সংযত গলায় বলল, আপনি বাড়ী ফিরে যান। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে দেব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে তার বিয়ের আয়োজন করুন।

—বেঁচে থাক বাছা আমি দু হাত তুলে তোমায় আশীর্বাদ করছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

এত কথা পারুলের কানে গেল না। সিঁড়ির হাতল ধরে খুব সাবধানে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। কোন রকমে ভেজানো দরজা খুলে টলতে টলতে বিছানায়।

দুপুরের দিকে পারুল একবার উঠল। খাবে না, শরীর খারাপ একথা আগেই বলে দিয়েছিল। নিচে গিয়ে দরওয়ানের সামনে দাঁড়াল।

—গ্রীণরুমের চাবিটা একবার দাও তো রামলোচন, কাল রাত্রে মাথার সোনার কাঁটাটা ফেলে এসেছি।

খাটিয়ায় বসে রামলোচন তুলসীদাস পড়ছিল, দাঁড়িয়ে উঠে পৈতেয় বাঁধা চাবির গোছা পারুলের হাতে তুলে দিল।

নিজের রুমে নয়, চাবি খুলে পারুল শান্তনুবাবুর কামরায় ঢুকল। বেশী খুঁজতে হল না, ড্রয়ারের কোণে চ্যাপ্টা বোতল। মন তাজা রাখবার ওষুধ। মেজাজ খুশ রাখার মন্ত্রগুপ্তি। শাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে পারুল সাবধানে বোতলটা ওপরে নিয়ে এল।

আঁচল দিয়ে পারুল বার বার চোখের জল মুছল। পোড়া চোখের জলের যেন আর শেষ নেই। দামী শাড়ী বের করল, জমকালো ব্লাউজ। সযত্নে প্রসাধন সারল। সব শেষে বোতলের ছিপি খুলে সারা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা ঢালল। শাড়ীতে, জামায়,

ঠোঁটের কাছেও মাখালো। উগ্র গন্ধ। গা বমি বমি করে উঠল পারুলের। বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এখান থেকে রাস্তার মোড় পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। অমিয়নাথ এলেই নজরে পড়বে।

শবরীর প্রতীক্ষা। পারুলের দুটো পা টন টন করে উঠল। কোমরে ব্যথা। মনে ভাবল বিছানায় একটু গড়িয়ে নেবে। সরে আসবার মুখেই অমিয়নাথকে দেখা গেল। দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

খুব আস্তে পারুল ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। সন্তর্পণে বন্ধ করল দরজাটা। হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিল। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়েই ছিল। বেশবাস অবিন্যস্ত। চুপ করে বসে রইল বিছানায়।

ঠুক, ঠুক, ঠুক। অমিয়নাথের মতনই শান্ত করাঘাত। খুব মৃদু গলার স্বর, পারুল, পারুল।

পারুল উঠে দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়ে ধরল নিচের ঠোঁট। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল অমিয়নাথের মুখোমুখি।

অমিয়নাথ পিছিয়ে গেল। উগ্র গন্ধ। চোখ লাল, বাতাসে উড়ছে এলোমেলো চুলের রাশ। পা দুটোও টলছে।

অমিয়নাথ কিছু বলবার আগেই পারুল মুখ খুলল, কি করতে ঘন ঘন আস বল তো? পকেটে তো কানা-কড়ির জোর নেই, অথচ সখ আছে ষোল আনা। এখানে সুবিধা হবে না, অন্য কোথাও যাও।

—পারুল, পারুল, অমিয়নাথের গলায় অসহায় কাকুতি!

—থাম, থাম, শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না। পারুল, পারুল! পারুল যেন ওঁর কেনা দাসী। বেরিয়ে যাও সামনে থেকে, নয়তো দরোয়ান ডাকব।

আর একটি কথাও নয়। অমিয়নাথ আস্তে আস্তে নেমে গেল। মাথা নিচু করে।

খুব ভয় পেয়েছিল পারুল। হয়তো পারবে না। ভেঙে পড়বে অমিয়নাথের সামনে। পা দুটো জড়িয়ে বলবে, তুমি আমাকে নাও। পথের ধূলো থেকে কুড়িয়ে তোমার আঙিনায় স্থান দাও।

কিন্তু পারুল পেরেছে। এলেম আছে মোশন মাস্টারের। শুধু কথাগুলোই নয়, হাবভাব চালচলন নিখুঁত। আর এ পথে আসবে না অমিয়নাথ।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পারুল দু গালে তুলি বোলাচ্ছিল। সময় বেশী নেই ড্রপ উঠলেই স্টেজে ঢুকতে হবে। হঠাৎ আয়নায় ছায়া পড়তেই উঠে দাঁড়াল।

দরজার কাছ বরাবর নিতাইবাবু। দুটো হাত জোড় করা, মুখে চোখে উদ্বেগের ছোঁয়াচ।

—কি হল নিতাইবাবু?

—আজ্ঞে বড় বিপদে পড়েছি। নিতাইবাবু ভাঙা গলায় বলল।

পারুল জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বলুন তো?

পকেট থেকে নিতাইবাবু পোস্টকার্ড বের করল। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা।

—একটু আগে পরিবারের চিঠি পেয়েছি। মেয়েটার দুদিন ধরে খুব জ্বর। আমায় বিশেষ করে যেতে লিখেছে। একেবারে একলা, ভয় পেয়ে গেছে।

—আপনি হরগোবিন্দবাবুকে বলেছেন?

—আজ্ঞে বলেছিলাম, তিনি বললেন মিহিরবাবু ছুটিতে, এখন আমি গেলে নাকি প্লে বন্ধ হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা পারুল মনে মনে একবার ভেবে নিল। হরগোবিন্দ-বাবুর কাছে সুবিধা হয়নি বলে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বাণীপীঠের ও তো শুধু একজন অভিনেত্রী। কর্ত্রী তো নয়। কিন্তু এটুকুও বুঝতে নিতাইবাবু ভুল করেনি—পারুলের কথার দাম আছে। ওরই ছোঁয়ায় বাণীপীঠের চড়া বাজার। হলে তিল ধারণের স্থান থাকে না। হরগোবিন্দবাবুকে পারুল কিছু বললে, তিনি ঠেলতে পারবেন না।

পারুল জিজ্ঞাসা করল, আপনি চলে গেলে প্রম্পটিং করবে কে?

নিতাইবাবু এমন একটা প্রশ্নের জন্য তৈরিই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল নিধুবাবু রয়েছেন। এর আগে করেওছেন কয়েকবার। একটা রাত ঠিক চালিয়ে নেবেন।

পারুল তুলি রেখে বাইরে বেরিয়ে এল। কামরা পর্যন্ত আর যেতে হল না। মাঝ পথেই হরগোবিন্দবাবুর সাক্ষাৎ মিলল। পারুলকে দেখে একগাল হেসে বললেন, কিগো পলিলতা, রেডি?

—আমি তো রেডি সন্ধ্যা থেকে। কিন্তু এদিকে এক ব্যাপার হয়েছে। পারুল হাসল।

কি ব্যাপার? হরগোবিন্দবাবু পারুলের দিকে এগিয়ে এলেন।

—নিতাইবাবুকে ছুটি দিতে হবে, ওঁর মেয়ের খুব অসুখ।

তোমার কাছে দরবার করেছে বুঝি, হরগোবিন্দ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসলেন। চোখ কুঁচকে বললেন, আরে ওসব কিছু নয়। পাড়াগাঁর ম্যালেরিয়া, ও ঠিক সেরে যাবে। তা ছাড়া ও গেলে আমার চলবে কি করে?

—কেন নিধুবাবু রয়েছেন, একটা রাত খুব চালিয়ে নিতে পারবেন।

হরগোবিন্দবাবু কথা বাড়ালেন না। পারুলের যদি ছুটি দেবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তো বাধা দেওয়াটা ঠিক নয়। এমনিতেই সিনেমার

দু একজন মাঝারি গোছের ডিরেক্টার ঘোরাঘুরি করছে আশে পাশে। চার ফেলেছে, মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখছে, মাছ এসে ভিড়ছে কিনা। কাজেই এসময় ওর সব কথায় সায় দিয়ে যাওয়াই ভাল।

—বেশ তো নিধু যদি চালিয়ে নিতে পারে আমার কোন আপত্তি নেই।

পারুল একটু ঝুঁকে হরগোবিন্দবাবুর কোটের আস্তিনে হাত বুলিয়ে বলল, ভদ্রলোক বড় কান্নাকাটি করছেন, যেতেই বলে দিই। একটা রাতের তো মামলা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পারুল ফিরে গিয়ে দেখল নিতাই বাবু ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। কাঠের পার্টিশনে ঠেস দিয়ে।

—আপনি চলে যান নিতাইবাবু, আমি কর্তাকে বলে দিয়েছি।

ছলছল চোখ, কৃতজ্ঞতায় নিতাইবাবু কুঁকড়ে গেলেন। গদগদ কণ্ঠে বললেন, বড় উপকার করলেন। এ আমি জীবনে ভুলব না। আমি চলি। সাতটা চুয়ান্নর গাড়ী ধরতে পারলেই ভাল।

—দেশ কোথায় আপনার? পারুল আলগোছে প্রশ্ন করল।

—কুসুমপুর।

দেয়াল ধরে পারুল টাল সামলাল। অনেক দিনের পিছনে ফেলে আসা একটা নাম, কিন্তু আজো মিশে আছে রক্তের মধ্যে। অস্থি মজ্জা মেদে। মাঝখানে একগাদা মানুষের মুখ, একরাশ শহর, কিন্তু তবু কুসুমপুরের মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল ছাওয়া ঘরগুলো জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে। ফেলে আসা গৃহস্থালীই নয়, ফেলে আসা মানুষও। রুচির বালাই নেই তবু খাঁটি মানুষ, কোথাও একটু খাদ নেই।

খুব আস্তে আস্তে পারুল বলল, কুসুমপুরে আমার এক আত্মীয় আছেন দূর সম্পর্কের।

যেতে যেতে নিতাইবাবু ফিরে দাঁড়াল, কুসুমপুরে আত্মীয়? কে বলুন তো?

পারুল বলল সেকেণ্ড মাস্টারের নাম, তার আস্তানা চাঁদিনী সিনেমার কাছাকাছি। বাজারের ধারে।

—আমার সঙ্গে কুসুমপুরের সম্পর্ক কম। বেশীদিন আসিনি এখানে। দেশভাগ হবার পর সব হারিয়ে কুসুমপুরে ডেরা বেঁধেছি। যাহোক আমি খোঁজ করব গিয়ে। বলব আপনার কথা।

—আমার কথা তোলার কোন দরকার নেই। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে বহুকালের ঝগড়া। এখনও তার জের মেটেনি। আপনি শুধু খোঁজ নিয়ে আসবেন একবার, ভদ্রলোক কেমন আছেন, ব্যস। দেখা করবার দরকার নেই।

মুখস্থ করা পার্টের মতন পারুল গড়গড় করে বলে গেল একটুও না থেমে। না ভেবে।

নিতাইবাবু চলে যেতেই কথাগুলো নিজের কানেই বেখাপ্পা ঠেকল। ঝগড়াই যদি চলছে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে তো খোঁজখবর নেবার এত আগ্রহ কিসের। কি জানি কি ভাবল নিতাইবাবু।

নিজের ঘরে ফিরে কথাটা মনে পড়ল। ভেবে চিন্তে পারুল মণি-অর্ডারে একশ টাকা পাঠাল। কুসুমপুর হাইস্কুলের ঠিকানায়। আস্তানা হয়তো বদল করেছে এর মধ্যে, তার চেয়ে স্কুলের ঠিকানায় পাঠানই ভাল। টাকা পাঠিয়ে মনে মনে পারুল খুব হাসল। করকরে নোট-গুলোর দিকে চেয়ে সেকেণ্ড মাস্টারের মুখের চেহারা কল্পনা করে। দুমাসের মাইনে এক মাসে পাওয়ার মতন। কোন লুকোচুরি নয়, আবছা নয় কিছু। আঁকা বাঁকা অক্ষরে স্পষ্ট করে নিজের নামও তলায় লিখে দিয়েছে। শ্রীমতি পারুল বালা দাসী। একবার ভেবেছিল নতুন

নামটাই লিখবে গোটা গোটা করে। পলিদেবী। কিন্তু এ নামে শহরের লোকেরা হয় তো চিনবে। সেকেণ্ড মাস্টার চিনবে না। আর মানুষটাকেই না চিনতে পারলে তার পাঠানো টাকাই বা নেবে কেমন করে।

সপ্তাহখানেক। পারুলের হাসি থেমে গেল। টাকা তো ফেরত এলই, সঙ্গে এক পার্শেল। ওপরে পারুলের নাম লেখা। দুএক মিনিট পারুল ভাবল। যে কটা জিনিষ আসার সময় পারুল আনতে পারেনি, মোড়কে ভরে সেকেণ্ড মাস্টার বুঝি সে কটাই পাঠিয়ে দিয়েছে।

মোড়ক খুলেই পারুল অবাক। আনকোরা গীতা একখানা। ঝকঝকে তকতকে। ভিতরের পাতায় ওর নাম লেখা। তলায় সেকেণ্ড মাস্টারের পাকা হাতের সই। ওপরে দুতিন লাইন কি সব লেখাও ছিল। সারার্থ, পাপের বোঝায় যাদের জীবনের পানসি ভরাডুবি হবার দাখিল, তাদের একমাত্র সম্বল ধর্মগ্রন্থ।

বার দশেক পড়ল। থেমে থেমে বানান করে করে, তারপর হাসিতে ফেটে পড়ল। সেকেণ্ড মাস্টার পুরুত মশায়ের নামাবলী গায়ে জড়িয়েছে। পাপী তাপী লোকদের ত্রাণকর্তা। বিছানায় উপুড় হয়ে পারুল হেসে খুন। চোখে জল না আসা পর্যন্ত।

মাস দুয়েক পর।

ঝলমলে পোষাকের ওপর রঙীন ওড়নাটা পারুল সেফটিপিন দিয়ে আটকে নিচ্ছিল, নিতাই বাবু সামনে এসে দাঁড়াল।

—কি খবর নিতাই বাবু, বাড়ীর সব ভাল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে সব ভালই আছে।

নিতাই বাবু ব্রাহ্মণ। পারুলের অবশ্য এখন কোন জাত নেই,

তবু তার আশীর্বাদেই নিতাই বাবুর বাড়ীর সব ভাল আছে। শুধু হিরোইনই নয়, খোদ মালিকের পেয়ারের লোক, কাজেই তার আশীর্বাদে কাজ হয় বৈ কি।

—তবে, নিতাই বাবু চোখ কোঁচকাল।

হাত দিয়ে মুকুট ঠিক করতে করতে পারুল ভ্রূ তুলল। বলল—আবার কি?

—মানে ইয়ে ওই কুসুমপুরের খবর। আপনার সেই আত্মীয়টির অবস্থা খুব খারাপ।

অবস্থা খারাপ! হাতটা কেঁপে উঠতেই মুকুট হেলে পড়ল। রঙীন ওড়নাও সরে এল খানিকটা। মাথা নিচু করে টাল সামলে পারুল মুখ তুলল। আস্তে আস্তে বলল, অবস্থা খারাপ? শক্ত অসুখ নাকি?

নিতাই বাবু একটু সরে এল। চৌকাঠ পার হয়ে ড্রেসিং রুমের ভিতর। ততক্ষণে পারুল একটা চেয়ার টেনে তার উপরে বসে পড়েছে।

একটু একটু করে নিতাই বাবু সব বলল। মেয়ের অসুখের সময় পারুলের সেই আত্মীয়টির খবর নেবার সুবিধা হয় নি। বাইরে বেরোতেই পারে নি কিন্তু মনে ছিল কথাটা। তাই এবার শনিবার রাতে বাড়ী গিয়ে রবিবার সকালেই খোঁজ করেছিল। বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয় নি। বাজারে জিজ্ঞাসা করতেই বলে দিয়েছে সেকেণ্ড মাস্টারের আস্তানা। একটু এগিয়েই খবর পেয়েছে। খুব শক্ত ব্যায়রাম। আজ তেরো-চোদ্দ দিন। দেখবার শোনবার তো কেউ নেই। স্কুলের অন্যান্য মাস্টারেরা পালা করে সেবা করছে।

কোন কথা নয়! নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত না। পারুল বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু সরে গেলেই কি রেহাই আছে! সেই কুৎসিত লোকটার ছায়া সর্বত্র। সিনের ওপর, উইংসের মাঝখানে, ফুটলাইটের সামনে।

পারুল নিজের মন শক্ত করার চেষ্টা করলো। নিজের হাতে সম্পর্ক কাটিয়ে এসেছে, সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলেছে। কোথায় কোন গ্রামান্তে একটা মানুষ জ্বরে কাতরাচ্ছে তাতে পারুলের বিচলিত হবার কি আছে!

কিন্তু কিছুতেই নয়। সব কিছু ঠেলে পুরানো স্মৃতি জ্বলজ্বল করে উঠছে মনের সামনে। সাত পাকের বাঁধন, কিন্তু সে বাঁধনতো নির্মম হাতে পারুল খুলে ফেলেছে। কুসুমপুরের গৃহস্থ বধূর আটপৌরে পোষাক সরিয়ে অভিনেত্রীর ঝলমলে আবরণ আর আভরণে নিজেকে সাজিয়েছে।

তবু নিস্তার নেই। মনটা কেবলি ফিরে ফিরে যায় কচুরিপানা ছাওয়া এঁদো ডোবা, বিসর্পিল আঁকা বাঁকা পথ, কুসুমপুরের নিরুত্তেজ পরিবেশে।

সাবধানে পারুল চোখ মুছে ফেলল। চোখের জলে গালের রং না উঠে যায়।

সেদিন পালা জমল না। সামনে বসা লোকগুলো হাততালির বদলে টিটকিরি শুরু করল। ব্যঙ্গের স্বরে বে-জায়গায় বাহবা! শেষ দিকে পারুলের গলা ভেঙ্গে গেল। দুচোখে অসহ্য জ্বালা।

ড্রপ পড়তেই হরগোবিন্দ বাবু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

—কি ব্যাপার?

ড্রেসিং আয়নার সামনে দু হাতে মাথা চেপে পারুল চুপচাপ বসেছিল। মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলল খুব ক্লান্ত গলায়, অনেকটা ঘুমের ঘোরে কথা বলার মতন, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।

হরগোবিন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—পোষাক ছেড়ে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি ডাক্তারকে একবার খবর পাঠাই।

—না, না পারুল হাত নেড়ে বারণ করল। ডাক্তারের দরকার নেই এমনি একটু ক্লান্ত লাগছে। কদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়েযাবে।

পরের দিন ভোরেই পারুল নিতাই বাবুকে ডেকে পাঠাল।

সারাটা রাত বিছানায় ছটফট করে কেটেছে। ভোরে উঠেও নিস্তার নেই। আশ্চর্য, রাতের অন্ধকারে যাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছিল, দিনের আলোয় তারই জন্য এত দরদ, এত মায়া! ভেবে পারুল কূলকিনারা পায় না। কয়েক লাইন মন্ত্র। হাতে হাত রেখে, আগুন সাক্ষ্য করে সামান্য লোকাচার, তার এত শক্তি।

বিনি সুতোর বাঁধন। কিন্তু দড়ির চেয়েও শক্ত।

একটু একটু করে নেশারঘোর কাটছে। এক রাতে বেগম সাজার মতন, এ জীবনের আকর্ষণ সাময়িক। পালার শেষে পোষাক খুলে ঘসে ঘসে মুখের গালের রং তুলে ফেলতে হয়। তারপর, তারপর মনটা কখন পায়ে পায়ে কুসুমপুরে ফিরে যায়! পারুল টেরই পায় না।

কেন ঘর ছেড়েছিল পারুল? কিসের আসায়? দু হাঁটুর ওপর মুখ রেখে পারুল চুপচাপ বসে রইল খাটের ওপর! একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে। রূপ ছিল না সেকেণ্ড মাস্টারের? কিন্তু রূপ কদিন থাকে মানুষের? রূপ তো পারুলেরও থাকবে না একদিন। যৌবনও নয়। তখন আজকে ওকে ঘিরে দাঁড়ান মানুষগুলো সরে যাবে আস্তে আস্তে। বাণীপীঠও ছাড়তে হবে। কে ওকে আশ্রয় দেবে? যাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে এত দূরে এসেছে, তাদের কেউ নয়।

নিতাই বাবু বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই পারুলের চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

—আসুন নিতাই বাবু।

ভোরে ডাক পড়াতে নিতাইবাবু এমনিতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। পারুলের গম্ভীর গলার স্বরে প্রমাদ গুণল।

—আজ বিকালেই আপনি একবার কুসুমপুরে চলে যান! এই টাকা নিন। কিছু ফলমূল নিয়ে যান অন্তত এক সপ্তাহের মতন। যে ডাক্তার দেখছেন তাঁর কাছে খোঁজখবর নিয়ে কি ওষুধ দরকার সেটাও জেনে আসুন। সামনের শনিবার যখন যাবেন, কিনে নিয়ে যাবেন। পারবেন না?

—এ আবার একটা কাজ। নিতাই বাবু ঘাড় নাড়ল, তারপরেই ভ্রু কোঁচকাল, কিন্তু—

—সে কথা ভাবতে হবে না, পারুল আশ্বাস দিল, আমি কর্তাকে বলে ঠিক করে দেব। আপনি কালই চলে আসবার চেষ্টা করবেন।

সারাটা দিন পারুল ছটফট করল। সব সময় কেমন একটা অস্বস্তি। দাঁতে মাছের কাঁটা ফুটে থাকার মতন।

একবার মণি অর্ডারের টাকাটা ফেরত এসেছিল, তখন অবশ্য সেকেণ্ড মাস্টার সজাগ ছিল, এবার জ্বরে অচেতন। সেবারে গোটা গোটা অক্ষরে পারুলের নাম লেখা ছিল, এবারে সে ভয় নেই। তাছাড়া টাকা পাঠানর পিছনে কিছুটা অহমিকা বোধ রয়েছে, করুণার ছিটে। রোজগারের পাত্র উপচে পড়ছে তার থেকেই কিছুটা পাঠাচ্ছি। কিন্তু ফলমূল ওষুধ বিষুধ দেওয়ার মধ্যে সেবার ছোঁয়াচ রয়েছে, সহানুভূতির মিশেল।

পরের দিন নিতাইবাবু ফিরল দুপুরের দিকে।

পারুলের একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল বালিশে মাথা দিয়ে কাত হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে কড়া নাড়ার শব্দ।

পারুল তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

—আসুন নিতাইবাবু, উনি কেমন আছেন?

একটু ভাল। জ্বর কম। তবে শরীর এখনও দুর্বল।

বলবার আগে পারুল কথাগুলো দুএকবার মনে মনে সাজিয়ে নিল।

—কথাবার্তা কিছু হল নাকি ?

নিতাইবাবু মুখ নিচু করে পকেট হাতড়াল। ছোট পকেট থেকে গুণে গুণে বের করল পাঁচখানা দশটাকার নোট।

—কি হল নিতাইবাবু? এবার অশ্রু ভেজা স্বর। অসম্ভব কাঁপছে দুটো ঠোঁট।

নিতাইবাবু খুব আস্তে বলল, প্রায় কানে কানে বলার মতন, জানলা দিয়ে সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন বিনা চিকিৎসায় চিতায় উঠবো, সেও ভাল, তবু নটীর পয়সায় পরমায়ু কিনব না।

পারুলের মনে হল কানের ফুটোয় কে যেন জলন্ত শীসা ঢেলে দিল। পৃথিবীর আর কোন শব্দ কানে এল না, কেবল সেকেণ্ড মাস্টারের কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ, নটী নটী, নটী !

উপেক্ষা নয়, অবহেলা নয়, অনাসক্তি নয়, দারুণ ঘৃণা।

শরীর খারাপের অজুহাতে হরগোবিন্দবাবুর সঙ্গে পারুল শিমুলতলায় গিয়ে উঠল। ফিরল প্রায় মাস চারেক পর। ওর মধ্যেই শরীর অনেকটা সেরেছে। গালের লালচে ছোপ ফিরে এসেছে। নিস্তেজ ভাবটা কেটে গেছে। চোখের কোলের ক্লান্তির ছায়াও উধাও।

হরগোবিন্দবাবুর মেজাজও খুশীতে ভরপুর। পারুলের স্বাস্থ্য ফেরা মানেই তাঁর বরাত ফেরা। আবার জমজমাট হবে 'বাণীপীঠ'।

ব্যাপার দেখে হরগোবিন্দবাবু বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কোন রকমে কথাগুলো শেষ করে পারুল ছুটে চলে এল উইংসের পাশে। টুল ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা, তার পরই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার বললেন, ক্লান্তি। শুধু দেহের নয় মনেরও। দেহের আর দোষ কি! রাতের পর রাত ধরে একটানা অভিনয়। নিশ্বাস ফেলার অবসর নেই। আর মন! মনের খবর হরগোবিন্দবাবু

জানেন না, সঠিক বলতে পারবেন না কিছু। কিন্তু হরগোবিন্দবাবু না জানুন, পারুল তো জানে। মনের ওপর কম অত্যাচার চলেছে! সেকেণ্ডমাস্টারের ঘর ছাড়ার পর থেকে একবিন্দু বিশ্রাম নেই। চাবুক উঠিয়ে কে যেন তাড়া করেছে পারুলকে। শুধু একপথ থেকে অন্য পথেই নয়, দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। একের আশ্রয় ছেড়ে অন্যের আশ্রয়ে।

ডাক্তার একটা টনিক দিয়েছিলেন, কিন্তু মুখে বলেছিলেন, চেঞ্জ দরকার।

ফিরেই হরগোবিন্দবাবু মন স্থির করে ফেললেন। রিজিয়া দিয়ে শুরু। পারুল বাইরে থাকার সময় 'বাণীপীঠ' কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে চালান হয়েছিল। এবারে সে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে।

হরগোবিন্দবাবু মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। 'রিজিয়া' নামালেন বটে খরচপত্র করে, কিন্তু বই জমল না। ভিড় হল, তবে এমন কিছু মারমার কাটকাট নয়। বাড়তি চেয়ার বাড়তি রইল, এদিক ওদিক বেশী দামের আসনও ফাঁকা। সপ্তাহখানেক পরে হল প্রায় খালি।

কারণটা কি? ট্যাঁকের জোর নেই লোকের, এমন কথা বলা চলে না। ফাঁকা জমি পেলেই সিনেমার হল উঠছে। স্টুডিওতে ফ্লোর খালি পাওয়াই দায়। আজকালকার দর্শক সিনেমা-পাগল। কায়ার বদলে ছায়া। সিনের পরিবর্তে সেলুলয়েড। থিয়েটারে পেট চলা দায়। ইজ্জত বাঁচানই সমস্যা। যোগাড়-যন্ত্র করে পারুল রজত সেনকে পাকড়াও করল। কিছুদিন আগে পর্যন্তও লোকটা পারুলের পিছন পিছন ঘুরেছে। একটা মুখের কথার আশায়। 'কল্পমায়া ফিল্ম প্রোডাকশন।' নাম যেমন গালভরা, রেস্ত সে অনুপাতে অনেক কম। সে জন্যই এতদিন পারুল এড়িয়ে গেছে। ছলছুতো করে।

সময় থাকতে রোজগার। যা অবস্থা কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়। এখন থেকে গুছিয়ে নিতে পারলে তবে অবেলায় কাজ দেখবে। থিয়েটার সিনেমা দু দাঁড়ে পারুল ভর দিল। একেবারে তর তর করে না বইলেও, জীবনতরী কোন চড়ায় না আটকায়।

একটু অবসর নেই। সারা দুপুর স্টুডিও, রাত্রে স্টেজ। মুখের রং মোছার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন করে রঙের প্রলেপ।

বই শেষ হল মাস চারেক পরে। বই শেষ হবার দিন পারুলের নতুন করে সেকেণ্ড মাস্টারের কথা মনে পড়ে গেল। প্রজেকশন দেখতে দেখতে ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির ঢেউ। বলা যায় না, ঘুরতে ঘুরতে এ বই হয়তো কুসুমপুরের 'চাঁদিনী' সিনেমায় গিয়ে পৌঁছবে। বাইরে বড় বড় প্ল্যাকার্ড, চোখ ঝলসানোই শুধু নয়, মন-মাতানোও। সামনে পারুলের আবক্ষ লাস্যময়ী ছবি। দুচোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। স্কুলফেরত সেকেণ্ড মাস্টার থমকে দাঁড়াবে। চেনা চেনা মুখ, হাসির ধরণটাও অজানা ঠেকবে না। আরো এগোলে নামটাও নজরে পড়বে। সিনেমার কল্যাণে পারুল নাম বদলে পলি। নতুন নাম হলে হবে কি, মানুষটা তো পুরানো। ঘৃণায় সেকেণ্ড মাস্টার মুখ ফেরাবে। বিকালে হয়তো ছাত্রদের জ্ঞানগর্ভ বাণী বিতরণ করবে সিনেমার সর্বনেশে মায়া সম্বন্ধে। ছাত্রদের না হয় বাণী বিলোবে সেকেণ্ড মাস্টার, কিন্তু পারুলকে কি পাঠাবে! ছোট সাইজের ধর্মগ্রন্থে এবার কুলোবে না, সপ্তকাণ্ড রামায়ণই হয়তো পাঠাবে লোক মারফৎ। কিম্বা হরিনামের মালা আর ঝুলি। এ সব ছেড়ে-ছুড়ে যাতে পারুল ধর্মের দিকে মন দিতে পারে। অনিত্য মোহ থেকে মুক্তিস্নান করে পরকালের চিন্তা।

মাস ছয়েক। আরো দুখানা বইতে কনট্রাক্ট। মঞ্চের স্তিমিত পাদপ্রদীপ থেকে দুহাজারী ভোল্টের আলোর বন্যা। কায়ার মোহিনী

মায়া থেকে ছায়ার সুনিবিড় রহস্য। পারুল থিয়েটারে বেশ কিছুটা ঢিল দিল। কেবল বিশেষ রজনীতে রঙ মাখা, তাও ডবল মজুরিতে।

সেদিন সুটিং থেকে ফিরে আসতে সন্ধ্যা গড়িয়ে এল। জবর খাটুনি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতেই পারুল খোঁপা খুলে ফেলল। চুলের ফিতেগুলো হাতে জড়াতে জড়াতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েই অবাক।

পাশের জানলা খোলা। সেখান দিয়েই নজরে পড়ল। এতকাল এদিকে পারুল খেয়াল করেনি। ফিরেই চায়নি। অবশ্য চাইবার মতন কিছু ছিলও না। প্রকাণ্ড এক কাঠের গুদাম। মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি, ততোধিক মোটা একটি লোক বসে থাকত চালার নিচে। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীর সার এসে দাঁড়াত। কুলির চীৎকার, গাড়োয়ান-দের হৈ চৈ। কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। কতদিন পারুল উঠে জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু তবু আওয়াজের কমতি নেই।

আজ কিন্তু ধারে কাছে কোথাও কাঠের নাম গন্ধ নেই। বিরাট বপু লোকটিও উধাও। ঝকঝকে তকতকে উঠান। মাঝখানে তুলসী-মঞ্চ। তার সামনে গলায় আঁচল জড়ান একটি বৌ হাঁটু মুড়ে প্রণাম করছে। আপাততঃ মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

জানলার গরাদে হেলান দিয়ে পারুল চুপচাপ দাঁড়াল। তুলসী-তলায় মৃৎ-প্রদীপের ক্ষীণ আলো। কিন্তু রাস্তার গ্যাসের ছটা এসে পড়েছে উঠানে। কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই।

ঠিক এমনি এক জীবনই পারুলের কাম্য ছিল। এমনি এক জীবনের সন্ধানেই সে ছুটে বেড়িয়েছে দিকে দিগন্তে।

কিন্তু ছুটোছুটিই সার। মৃগতৃষ্ণিকার মোহে বার বার পারুল ঘরের আগল ভেঙে বেরিয়েছে, কিন্তু কোথাও তৃপ্তি পায়নি। বুকে দারুণ দাহ নিয়ে ছিটকে পড়েছে এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয়ে।

বৌটি উঠে দাঁড়াবার আগেই জুতোর মস মস শব্দ। ছাতি হাতে একটি পুরুষ এসে দাঁড়াল। মেটে রং, ঢেউ খেলান চুল, মুখে হাসির ছিটে।

—দেবী, আমি তুষ্ট, বর প্রার্থনা কর। ঠিক বৌটির পিছনে দাঁড়িয়ে পুরুষটি ভারি গলায় বলল।

সঙ্গে সঙ্গে বৌটি উঠে দাঁড়াল। কপাল বরাবর ঘোমটা। সিঁদুরের টিপ, মুখ মুচকে হেসে বলল, যাও, ঠাকুর দেবতা নিয়ে খেলা, না?

—বারে, আমি ছাড়া তুমি অন্য ঠাকুরের ভজনা করতে যাবেই বা কেন?

—উঁ, ভারি আমার ঠাকুর রে! বৌটি মুখ বেঁকিয়ে অপরূপ হাসল।

চেয়ে চেয়ে আশ যেন আর মেটে না পারুলের। একটা চেয়ার পেতে জানলার কাছে বসে পড়ল। ঘর অন্ধকার। ধরা পড়বার কোন ভয় নেই।

এরপর পুরুষটি ফিস ফিসিয়ে কি বলল শোনা গেল না, কিন্তু দেখা গেল বৌটি গুম করে কিল বসাল লোকটির পিঠে। তারপর হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

পুরুষটিও পিছন পিছন।

রঙ্গমঞ্চ শূন্য। কেবল তুলসীতলার প্রদীপটি জ্বলছে টিম টিম করে। কতটুকুই বা আলো! উঠানের সামান্য একটু অংশ শুধু আলোকিত হচ্ছে। কিন্তু বাইরের আলো আর কতটুকু! পারুলের মনের আনাচে কানাচে কোথাও একটু অন্ধকার রইল না। সামান্য অস্পষ্টতাও নয়।

কিছুদিন থেকেই কেমন একটা ক্লান্তি। জীবিকার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস, কিন্তু জীবনের শূন্যতা ভরছে না কিছুতেই। কি যেন পারুল ফেলে এসেছে। কোথায় যে ফেলে এসেছে তাও তার জানা নেই। আবার বুঝি মাড়িয়ে মাড়িয়ে এতটা পথ ফিরে যেতে হবে।

কথাটা হঠাৎ পারুলের মনে হ'ল। ভুল করেছে। এত দূরে, এতগুলো মানুষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসে একথা বলতে পারুলের আর কোন দ্বিধা নেই। ভুল করেছে সেকেণ্ড মাস্টারের ঘর ছেড়ে। ঘরের মানুষ পছন্দ হয়নি বলে পথে পা দেবে? রাজ্যের ধূলো কাদা গায়ে মেখে পরের দরজায় দরজায় দাঁড়াবে ভালবাসার ভিক্ষার ঝুলি পেতে? তার চেয়ে ঘরের মানুষকে মনের মানুষ করে তুলতে কেন চেষ্টা করেনি পারুল! শুধু দেহটাকেই টেনে হিঁচড়ে এনেছে সেকেণ্ড মাস্টারের সংসার থেকে, মনটা বুঝি এক পাও এগোয় নি। তা নাহলে ফেলে আসা মানুষটার কথা মনে হলেই বুকটা কেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

ছোট সংসার। বাপের স্নেহ আর মার মমতায় গড়া দু একটি সন্তান। অভাব, অনটন, ক্ষয় ক্ষতির পাশাপাশি স্বামীর ভালবাসা, শিশুদের কলকণ্ঠ,—সংসারের নিটোল, নিভাঁজ ছবি। অনেকটা জানলা দিয়ে চুরি করে দেখা ওই ছোট সংসারের মতনই। এমন একটি সংসার পারুলও গড়ে তুলতে পারত। আশা দিয়ে, আকাঙ্ক্ষা দিয়ে, প্রেম আর প্রীতির পত্রসম্ভারে পরিপাটি এক নীড়। তা না করে রাতের অন্ধকারে পারুল পালিয়ে এসেছে। অন্য লোকের ছলনার হাতছানিতে ভুলে। নাম ভাড়িয়ে রং মাখছে দু গালে, নকল পোষাকে নিজেকে সাজাচ্ছে হাজার মানুষের মন ভোলাতে।

নিচু হয়ে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় মুখটা দেখেই পারুল বিরক্তিতে সরে গেল। ঘামে রঙ উঠে গেছে দু এক জায়গায়। গরাদে মাথা রাখবার সময় কপালে কালো কালো ছাপ পড়েছে, ঠোঁটের রং থুতনিতে লেপে একাকার। পারুল নেই, পলি। সেকেণ্ড মাস্টারের বৌয়ের প্রেতায়িত রূপ।

চোখ ফেটে পারুলের জল গড়িয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ

পর আবার উঁকি দিয়ে দেখল। তুলসীমঞ্চের প্রদীপ নিভে গেছে। এদিকের কোণের ঘরে বাতি জ্বলছে।

আস্তে আস্তে পারুল জানলার কাছ থেকে সরে এল।

দিন দশেক পরে। সকালে বিছানায় শুয়ে পারুল আড়ামোড়া ভাঙছিল। রাত তুটো পর্যন্ত সুটিং চলেছে। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। ছটফট করেছে। যতদিন যৌবনটুকু আছে, আদর ঠিক ততদিনই। এর পর বয়সের ভার নামলে, মাংস কুঁচকে এলে, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এলে, এরা আর কেউ এসে দাঁড়াবে না! পলির নামই ভুলে যাবে। এত কাছে এগিয়ে আসা হরগোবিন্দবাবুও আর খোঁজখবর করবেন না। তখন কি অবস্থা হবে পারুলের!

পারুল ওঠবার চেষ্টা করল। ভোরে উঠে স্নান না করতে পারলে, ম্যাজম্যাজ করবে শরীর। মাথাধরাটাও ছাড়বে না।

দরজায় খুট খুট শব্দ। চাদরটা বুক বরাবর টেনে দিয়ে পারুল ঘাড় ফেরাল, কে?

দরজা ঠেলে সাতু ঘরে ঢুকল। থিয়েটারের ঝি।

এগিয়ে এসে বলল, একটি বাবু দেখা করতে এসেছেন।

—বাবারে বাবা! বিরক্তিতে পারুল ভেঙে পড়ল, বাবু আসার আর কামাই নেই। সাত-সকালে আবার কে এলেন!

বিরক্ত হল বটে, কিন্তু পারুল বিছানায় উঠেও বসল। সিদ্ধেশ্বরবাবু ছাড়া আর কেউ নয়। কদিন থেকে পিছনে লেগেছেন। আগের দিন স্টুডিওতেও দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু পারুল ব্যস্ত থাকায় সুবিধা হয়নি। শুধু দেখার চেষ্টা! টেলিফোনের পর টেলিফোন। বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্র। পকেট এদিকে গড়ের মাঠ, অথচ ছবি তোলার নেশা।

দু হাত মাথার ওপর তুলে পারুল হাই তুলল। বলল, বলগে যা শরীর খুব খারাপ। শুয়ে আছেন।

—বলেছিলাম মা, কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললেন, যত খারাপই হোক শরীর, আমি একবার দেখা না করে যাব না।

আশ্চর্য লোক তো। পিঠের ওপর ভেঙে পড়া খোঁপাটা আলতো হাতে পারুল জড়িয়ে নিল। বলল, আঃ, একেবারে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। কথাটা বলেই পারুলের খেয়াল হল, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে আর লাভ কি? মানুষটা কে তারই খোঁজ নেওয়া যাক আগে। সিদ্ধেশ্বরবাবু তো নাও হতে পারেন। এদিক ওদিক থেকে জাঁদরেল কেউ হওয়াও আশ্চর্য নয়! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে। তার ওপর এমন মন্দা বাজারে।

—নামটা কি জিজ্ঞাসা করে আয় তো সাতু, আমার শরীর আর বইছে না।

পারুল আলগোছে শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে নিল। পা ঝুলিয়ে বসল খাটের ওপর। চুনোপুটি হলে ধুলো পায়েই বিদায় করে দেবে।

শুধু জিজ্ঞাসা নয়, সাতু একেবারে নামটা লিখে নিয়ে এল। আঁকবাঁকা বালির কাগজে। পারুল অনেকক্ষণ ধরে পড়ল। চুনোপুটি তো নয়, রীতিমত রাঘববোয়াল। কিন্তু মতলব কি সেকেণ্ড মাস্টারের, একেবারে সশরীরে হাজির? সূর্য ওঠবার আগেই। ঠিকানা যোগাড় করল কোথা থেকে!

একটু বসতে বল, আসছি। পারুলের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পারুল ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করল। আর কিছু নয়, এতদিন পরে বোধ হয় 'চাঁদিনী' সিনেমায় 'অকাল-বসন্ত' ছবিটা এসেছে। প্ল্যাকার্ডে

আঁকা পারুলের রঙচঙে মুখ। লোক মারফৎ উপদেশ নয়, এবার সেকেণ্ড মাস্টার নিজেই চলে এসেছে। অধঃপতন থেকে পারুলকে বাঁচাবে। বলা যায় না, প্রায়শ্চিত্তের বিধান নিয়েই হয়তো এসেছে। গোবর মুখে দিয়ে জাতে ওঠার প্রস্তাব।

পারুলের দুটো চোখ জ্বালা করে উঠল। কেবল শুকনো উপদেশ, আর কিছু কি দিতে পারে না সেকেণ্ডমাস্টার। হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে পারেনা বুকে। কাদা মুছে, কালি ধুয়ে, ঘরে নিয়ে তুলতে পারেনা!

কেন কি ক্ষতি ছিল আগে থেকে একটা চিঠি লিখে জানাতে। তুমি তৈরি থেকো, আমি আসছি। পারুল তো মনকে তৈরি করেই রেখেছিল। কুসুমপুরে না হোক, অন্য কোথাও আস্তানা বাঁধতে কোন অসুবিধা নেই। রঙ মাখার সাধ পারুলের ঘুচে গেছে। একটুও মোহ নেই। জীবনের সমস্ত রঙ বিকিয়ে তবে এ রঙের পশরা আহরণ করতে হয়।

ওর দুঃখ কেউ বুঝবে না। মুখে গালে রঙ ছুঁইয়ে ক্যামেরার সামনে আর পাদপ্রদীপের আলোয় মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা ফুটিয়ে তুলবে দিনের পর দিন, অথচ মানুষ ফিরেও চাইবে না ওর ব্যথাতুর জীবনের দিকে।

বেশ তাই হোক। পারুলই বা কেন নিচু হবে মানুষের সামনে। সেকেণ্ড মাস্টার এসেছে বলেই বুঝি আটপৌরে শাড়ীতে নিজেকে সাজিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। অনুশোচনায় মেদুর দু চোখের দৃষ্টি। অনুতাপ কাতর মুখ।

. দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ পারুল দাঁড়িয়ে রইল। কি একটা ভেবে নিল, তারপর পরিপাটি করে নিজেকে সাজাতে শুরু করল।

পাতলা ফিনফিনে জর্জেট। দেহের ইশারা সুতোর টানাপোড়েনের ফাঁকে ফাঁকে, হাতকাটা ব্লাউজ, কাচ বসান। চোখের কোণে কাজলের টান, দু গালে রুজের আভা, পাউডারের প্রলেপ মুখে ঘাড়ে, লাল টুকটুকে ঠোঁট, রঞ্জনী দশ আঙুলের নখের আগায়। চুলের গোছা জালের বাঁধনে আটকান। ইভনিং-ইন-প্যারির মন-মাতানো সুবাস। নিচে নামার মুখে কি ভেবে পারুল টিপয় থেকে হাত ঘড়িটা কব্জিতে পরে নিল। বাইরে যাবার মুখে হঠাৎ উটকো মানুষ সামনা-সামনি এসে পড়েছে অনেকটা এই ভাব। থমকে দাঁড়াবে একটু, দু চোখে উপেক্ষার ছিটে। কোথা থেকে আবার আপদ এসে জুটল। তা হলেই সেকেণ্ড মাস্টার পালাবার আর পথ পাবে না, নীতিকথা নিজের ঝুলিতে পুরে।

সিঁড়িতে নামতে নামতে কথাটা পারুলের মনে পড়ল। এও হতে পারে, বিষ দাঁত ভেঙে গেছে সেকেণ্ড মাস্টারের। মাস্টারদের কি একটা গোলমাল বুঝি শুরু হয়েছে। মাইনে বাড়ানোর জন্য কান্নাকাটি। স্টুডিওতে কে একজন সেদিন বলছিল কাগজ পড়ে পড়ে। তাই বুঝি এবার বুকে হেঁটে বাড়ির চৌকাঠে এসে পৌছেছে।

দরজার দিকে পিছন, আড়াআড়ি ভাবে দুটো হাত বুকের ওপর। খদ্দরের চাদর জড়ানো, রং একসময়ে হয়তো মরালশুভ্র ছিল, আজ পাঁশুটে, সহস্রছিন্ন।

দরজার পাল্লায় হাত দিয়ে পারুল চুপচাপ দাঁড়াল। সেকেণ্ড মাস্টার কি বলবে তাই বোধ হয় ঠিক করে নিচ্ছে মনে মনে। কোন শাস্ত্র আওড়াবে তারই ফিরিস্তি কিংবা কি ভাবে ভিক্ষার ঝুলি মেলে ধরবে তারই পন্থা।

ভেলভেটের চটিটা পারুল মেঝেয় ঠুকল। বেশ জোরে। আওয়াজে সেকেণ্ড মাস্টার চমকে ফিরে দাঁড়াল।

এবার চমকাবার পালা পারুলের! উঁচু চোয়াল, কণ্ঠাসর্বস্ব চেহারা, শীর্ণ শিরাবহুল হাত। মানুষটা যেন ধুঁকছে, কিন্তু তবু উজ্জ্বল দুটি চোখের তারা। আগুন-মাখানো দৃষ্টি।

এই কাঠামোয় এত প্রতাপ। বাড়ি বয়ে উপদেশ দেবার সাহস। কঠিন গলায় পারুল বলল, কি বলবে বল? এখনি আমায় আবার বেরোতে হবে—

মাঝপথেই পারুল থেমে গেল। সেকেণ্ড মাস্টার পারুলের কাছ বরাবর এগিয়ে এল। চেয়ে চেয়ে আপাদমস্তক দেখল। নীল ভেলভেটের স্ট্র্যাপ থেকে লাল কুঙ্কুমের টিপ, সযত্ন প্রসাধিত মুখশ্রী। অনেকক্ষণ দেখল, তারপর খদ্দরের চাদর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করল।

মাস ছয়েকের শিশু। সেকেণ্ড মাস্টারের শুকনো পাঁজরগুলোয় মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। খুব সন্তর্পণে সেকেণ্ড মাস্টার তাকে কৌচের ওপর শুইয়ে দিল। তারপর আবার টান হয়ে দাঁড়াল পারুলের মুখোমুখি।

—আমাদের স্কুলের ভূগোলের মাস্টার যদুগোপালের ছেলে। কলেরায় বাপ আর মা তিন ঘণ্টার আড়াআড়িতেই শেষ। তিন কূলে দেখবার কেউ নেই। বুকে করে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। নিয়ে তো এলাম, কিন্তু খাওয়াব কি! দুদিন চেষ্টা করলাম, কিন্তু কুসুমপুরে কেউ নিল না। সবাইয়ের অবস্থাই তো খারাপ। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম তোমার তো অঢেল পয়সা, কারণে অকারণে এদিক ওদিক ছিটোচ্ছ। তুমি এই বাচ্চাটার ভার নাও, একে মানুষ করে তোল।

এতগুলো কথা সেকেণ্ড মাস্টার একটানে বলে হাঁপাতে শুরু করল। দম নিল দুহাতে বুক চেপে।

দরজার দিকে আর একটু সরে গিয়ে সেকেণ্ড মাস্টার খুব আস্তে

বলল, প্রায় ফিসফিসিয়ে, বাচ্চাটাকে মানুষ করে তুলো, বুঝলে? তাতে পাপের বোঝা একটু হয়তো কমবে তোমার। সত্যিকারের মানুষ করে তুলো তোমার চারপাশের পঙ্কিল স্পর্শ বাঁচিয়ে।

সেকেণ্ড মাস্টার থেমে গেল। কামারের হাপরের মতন একটানা নিশ্বাসের শব্দ।

মোজেইক মেঝে সরে গেল পারুলের পায়ের তলা থেকে। সব অস্পষ্ট। চেয়ার, টেবিল, শিলিংপাখা, সেকেণ্ড মাস্টারের দারিদ্র্য-জর্জর কাঠামোটাও। কৌচ ধরে টাল সামলাতে গিয়েই হাত ঠেকে গেল। ঘুম ভেঙে কচি কচি দুটো হাত বাড়িয়েছে কুসুমপুর স্কুলের ভূগোলের মাস্টারের ছেলেটা। নরম তুলতুলে স্পর্শ, পাউডারের হালকা পাফের মতন। নিচু হয়ে তাকে কোলে তুলে নিতে নিতেই পারুল দেখতে পেল, খদ্দরের চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে সেকেণ্ড মাস্টার আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ঋজু চেহারা। হাজার দুঃখে, হাজার কষ্টে ঘুণ ধরেছে শরীরের কাঠামোয়, কিন্তু মেরুদণ্ড একটু বাঁকা হয়নি, উঁচু মাথা একটু নিচু নয়।

দ্রুতপায়ে পারুল এগিয়ে গেল। বাচ্চাটাকে বুকে চেপে। দরজার গোড়ায় পৌঁছে সেকেণ্ড মাস্টারের খদ্দরের চাদর আঁকড়ে ধরল।

—এই শোন, একটু দাঁড়াও লক্ষ্মীটি।

সেকেণ্ড মাস্টার ফিরে দাঁড়াল, কি?

—আমি যাব তোমার সঙ্গে।

—তুমি? সেকেণ্ড মাস্টারের দুচোখে অগাধ বিস্ময়। ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ।

—হ্যাগো! আমি আর পারছিনা, যত রাজ্যের ধূলো এসে জমেছে গায়ে। একটু মায়া হয় না তোমার, একটু দয়া নয়?

সেকেণ্ড মাস্টার উত্তর দেবার আগেই পারুল বাচ্চাটাকে মেঝের

লুটিয়ে দিয়ে সেকেণ্ড মাস্টারের দু পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

—তুমি অভিনয়ে নাম করেছ তা শুনেছি, কিন্তু এমন একটা অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি। দৃঢ় গলা সেকেণ্ড মাস্টারের।

পারুল পা ছাড়ল না। সশব্দে মাথা ঠুকল, চীৎকার করে বলল, ওগো তুমি একটিবারের জন্যও বিশ্বাস কর, এ আমার অভিনয় নয়। তুমি আমাকে এখানে একলা রেখে চলে যেও না। এ জীবনে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমাকে তুমি ফিরিয়ে নাও তোমার কাছে।

সেকেণ্ড মাস্টার অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। মুখ তুলেছে পারুল। চোখের অবিরল ধারায় কাজলের টান, রুজের ছোপ, পাউডারের প্রলেপ ধুয়ে মুছে উধাও। পলির ছদ্ম আবরণ খসে পড়েছে। অভিনেত্রীর নির্মোক আর নেই।

—তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে? সেকেণ্ড মাস্টারের কণ্ঠ অনেক কোমল, অনেক দয়ার্দ্র।

—যেখানে নিয়ে যাবে। শুধু তুমি আমাকে ভেঙে চুরে তোমার মনের মতন করে নাও।

সেকেণ্ড মাস্টার কথা বলার আগেই বাচ্চাটা কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে পারুল বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। অশ্রুসিক্ত গলায় বলল, বল, আমাকে ফেলে যাবে না?

সেকেণ্ড মাস্টার কি বুঝি ভাবল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, তোমার এ চোখের জল যদি সত্যি হয়ে থাকে তো তোমার অপরাধ যিনি মার্জনা করবার তিনিই করবেন। কিন্তু এই বাইজীর পোষাকে এ পথ দিয়ে তোমায় নিয়ে যেতে পারব না।

পারুল এতক্ষণে চোখের জল মুছল হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে। মুখে হাসি ফোটাল। বলল, একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি আসছি। এ পোষাক আমার গায়েও বুঝি কম ফুটছে?

দ্রুত পদক্ষেপে পারুল ওপরে উঠে গেল। সেবার পোশাক বদলাতে এত সময় লেগেছিল, এবার কিন্তু মিনিট পাঁচেক [illegible] লাগল না। আটপৌরে শাড়ী, সাধারণ ব্লাউজ। শুধু সিঁথিতে [illegible] সিঁদুর, সেকেণ্ড মাস্টারের পরমায়ুর নিশানা।

বাচ্চাটাকে সাবধানে বুকে জড়িয়ে পারুল সেকেণ্ড মাস্টারের [illegible] এসে দাঁড়াল। মাথায় ঘোমটা টেনে অল্প হেসে বলল, [illegible]।

ফটক পার হয়ে দুজনে পিচঢাকা সড়কে গিয়ে [illegible] চিন্তা নেই পারুলের, কোথায় যেতে হবে তার কোন [illegible] দেখাবার মানুষটা তো পাশেই রয়েছে।

পথের শেষে এসে মুখ তুলে তার দিকে চাইলেই হবে।